র্ষ ঃ ৩ । সংখ্যা ঃ ১০ । এপ্রিল-জুন ২০০৭

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৩ সংখ্যা : ১০

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন ২০০৭

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪ পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

Published by Advocate MUHAMMAD NAZRUL ISLAM General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14, Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207,Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

মানুষের মৌলিক অধিকারকে কিভাবে নিরাপদ করা যেতে পারে

জন্মের পর আত্মরক্ষা ও আত্মনিরাপত্তা ব্যবস্থার দিক দিয়ে পশু পাখি কীটপতংগ ইত্যাকার সমস্ত প্রাণীর তুলনায় মানুষের অবস্থান সবচেয়ে দুর্বল। অন্ততপক্ষে একজন মা বা দুটি হাত যদি এগিয়ে না আসে তাকে কোলে তুলে নেবার জন্য তাহলে তার পক্ষে পৃথিবীপৃষ্ঠে বেঁচে থাকা এবং জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এটা তার প্রথম মৌলিক মানবিক অধিকার। হাজার হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানব সমাজে যত আদিম সমাজই হোক না কেন এটা স্বীকৃতি লাভ করে আসছে ঠিক যেমন জীবনের জন্য বাতাস, মাছের জন্য পানি।

মানুষ যখন একা বা বিচ্ছিন্ন ছিল তখনো প্রকৃতির কাছ থেকে সে অধিকার লাভ করেছে। নাহলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। মানুষের সমাজ গঠিত হয়েছে অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েই। সমাজ হচ্ছে আসলে কিছু অধিকার ও সীমানার সমষ্টি। আদিম থেকে আধুনিক যুগে মানুষের পদার্পণ অধিকার সচেতনতার ভিত্তিতেই। মানুষ যতই অধিকার সচেতন হয়েছে, অধিকার আদায় ও অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যতই যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়সংগত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে ততই তার সমাজ উন্নত এবং সামাজিক জীবন নিরাপদ ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। আসলে সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়া সম্পদশালিতা সুখ ও সমৃদ্ধি অর্থহীন। ভালো কাজ করা এবং খারাপ কাজ না করা দুটোর মধ্যে একটা ইতিবাচক দিক রয়েছে। ভালো কাজ করলে যেমন ভালোর সমৃদ্ধি হচ্ছে তেমনি খারাপ কাজ না করলে ভালোর সমৃদ্ধির পথে বাধা দূর হচ্ছে। অর্থাৎ খারাপ কাজ না করে অথবা খারাপ কাজ করলে যথাযথ শাস্তির বিধান থাকলে ভালো কাজ করার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। এটা মানুষের একটা মৌলিক অধিকার। অর্থাৎ মানুষ তার ন্যায্য পাওনা লাভ করবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে। এ পথে যত বাধা ও প্রতিবন্ধকতা থাক সবকিছু উতরে সে তার পাওনা পুরোপুরি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতে সক্ষম হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগকে যে 'খাইরুল কুরুন' বা সবচেয়ে ভালো যুগ বলেছেন তার একটি দিক এই অধিকার সচেতনতা। ইসলামের প্রভাব বলয়ে যারাই এসেছে তারাই এই অধিকার লাভ করতে

পুরোপুরি সক্ষম হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের প্রভাব বলয় যেখানেই সক্রিয় থাকবে সেখানেই এই অধিকার পুরোপুরি অর্জিত হবার ব্যবস্থা থাকবে।

আজকের পৃথিবী এই অধিকারের প্রশ্নে কতটুকু সচেতন? আজকের পৃথিবীতে এই অধিকার এখনো দাবির আকারে রয়ে গেছে। ইকবাল যথার্থ বলেছেন,

'পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের রূপ কি দেখোনি চেয়ে
উজ্জ্বল দেহ, চেংগিজী দিল আঁধারে ফেলেছে ছেয়ে।'

এটাই আজকের বিশ্ব ব্যবস্থার রূপ। বিশ্বের ওপর যারা একক কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন তাদের দৈহিক ঔজ্জ্বল্যের কমতি নেই। বাহ্যিক নিয়ম-নীতি আইন কানুনের মনে হয় তারাই সবচেয়ে বড় অভিভাবক ও খাদেম। এজন্য তারা জীবন দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সম্পদ সময় মেধা সবই এজন্য উৎসর্গ করেছেন। মানবাধিকারের তারাই সবচেয়ে বড় প্রবক্তা স্রষ্টা ও রক্ষক। কিন্তু এসবই বাইরের চাকচিক্য। ভেতরের চেংগিজী অন্ধকার সূচীভেদ্য। ৯/১১ এর পরে এটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে ইউরোপ এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া সর্বত্র এদের কর্তৃত্ব বলয়ে মানুষের মৌলিক অধিকার নিরাপদে নেই। এদের স্বার্থের হাতে বন্দী। প্রাচীন অন্ধকার যুগের দাসদের চাইতেও এদের কাছে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার কম মূল্যবান। এদের কথায় ও কাজে আসমান জমিনের ফারাক থেকে অনুভব করা যায় এদের মনের অন্ধকার। এদের দুই নীতি। নিজেদের জন্য একটা বিরোধীদের জন্য মানে নিজেদের জাতিগোষ্ঠীর বাইরের বিরোধীদের জন্য অন্য একটা নীতি। অন্যদের মানবাধিকারের কোনো প্রশ্নই নেই। একমাত্র পৃথিবীতে এরাই মানুষ এবং এদের মানবিক অধিকার আছে। বাকি আর সবাই এদের অধীনস্থ। এদের চিন্তা, এদের সংস্কৃতি, এদের মননে যারা যতটুকু রঞ্জিত তারা ততটুকু মানবিক অধিকার লাভের যোগ্য। ফরাশী বিপ্লব, ইউরোপীয় রেনেসাঁ কোনোটাই এদের চিন্তা ও মননকে বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। নিজেদের তৈরি করা সংকীর্ণতার গণ্ডী থেকে এরা বের হয়ে আসতে পারেনি।

তাই আজকের বিশ্বব্যবস্থায় মানবতা এবং মানবিক অধিকার এদের হাতে বন্দী। বিশ্বে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এদেরই তৈরি। প্রজাদেরকে রাজার দাস বানিয়ে রাখা, তাদের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়া এদেরই চিন্তা ও কর্মের সমষ্টি। কালের বিবর্তনে সেখান থেকে আধুনিক গণতন্ত্রে উত্তরণ নিছক একটি কর্তৃত্বের চেহারা বদল। নয়তো এই গণতন্ত্র সাধারণ জনগণের তন্ত্রে কোনোদিন পরিণত হতে পারেনি। নির্বাচন ও ভোটের যে পদ্ধতি এখানে অবলম্বিত হতে বাধ্য তাতে রাজতন্ত্রের প্রেতাত্মাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পথই খোলসা হয় মাত্র। সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার লাভের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। আবার মহাজনী সুদী অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটিকে নিজেদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। তারপর আজকের আধুনিক বিশ্বে সেই ব্যবস্থাটিকে

ব্যবসা বাণিজ্য ও ঋণদানের আর্থিক সহায়তার নামে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংক এদেরই হাতে। আন্তরজাতিক অর্থ তহবিল, এশিয়া ডেভলপমেন্ট ব্যাংক, জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল সবই এদের। এদের কর্তৃত্বের কোথাও একচুল হেরফের নেই। আবার ছয়টি শীর্ষ রাষ্ট্রের মোড়লীপনা। এমনকি সারা দুনিয়ার সব রাষ্ট্রের সম্মিলিত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও সেখানে নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি বড় শক্তিকে ভেটো পাওয়ার দিয়ে শাসকদের একটি মহাজনী গোষ্ঠী তৈরি করা, এ সবই সাধারণ মানবিক অধিকার হরণ করার একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্বকে যতই আধুনিক, অত্যাধুনিক ও আধুনিকোত্তর বলা হোক না কেন এদের এবং এই মানবাধিকার হরণকারী গোষ্ঠীর কোনো পরিবর্তন নেই। ইকবাল এদের চেহারা এভাবে তুলে ধরেছেন–

'যদিও বৃদ্ধ আদম

জওয়ান এখনো লাত ও মানাত।'

এদের কৌশল পূর্ণ শক্তিতে এগিয়ে চলছে। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার নির্মমভাবে পদদলিত হচ্ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় শক্তির মাধ্যমে।

এদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য অনেক উপায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব মুক্ত করা। হাজার হাজার বছর থেকে এরা মানুষকে দাসে পরিণত করে রেখেছে। মানুষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসে পরিণত করে রেখেছে। এদের এই দাসত্ব শৃংখল থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে। এ দাসত্ব মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাস হতে হবে। আর এমনিতো প্রকৃতিগতভাবে সমস্ত মানুষ আল্লাহর দাস হয়েই আছে। মানুষের সমস্ত দেহ, দেহের সমস্ত অংগ প্রত্যংগ, সমস্ত কলকব্জা, সমস্ত যন্ত্রপাতি, শিরা উপশিরা, রক্ত প্রবাহ সবই সরাসরি আল্লার দাসত্ব করছে। এদের ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কোনো কর্তৃত্ব নেই। এদের যাকে যে কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে সে সেই কাজ করে যাচ্ছে। এটা তার দায়িত্ব ও মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা কারোর নেই। চোখকে দেখার জন্য তৈরি করা হয়েছে। দেখা তার মৌলিক অধিকার। তার দেখার ক্ষমতা হরণ করে তাকে দিয়ে খাওয়ার কাজ করার ক্ষমতা কারোর নেই। কাজেই তার মৌলিক অধিকার নিরাপদ।

মানুষ চাক বা না চাক প্রকৃতিগতভাবেই সে আল্লাহর দাস। কিন্তু বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান প্রজ্ঞার দিক দিয়ে মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের দাস হতে পারে। কারণ এখানে তার একটা স্বাধীন ব্যবহার ক্ষমতা আছে। বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান প্রজ্ঞা সবই আল্লাহর সৃষ্টি। এদের ওপরও আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। তবে এদেরকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা দিয়েছেন। এ ক্ষমতার দরোজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যে কেউ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে। তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হরণ করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে তার সাংস্কৃতিক সামাজিক এবং অন্যান্য যাবতীয় অধিকারও হরণ করে তাকে নিজের দাসে পরিণত করতে পারে। মানবিক মৌলিক অধিকার হরণের এটাই একটা পথ।

বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান প্রজ্ঞাকে যদি মানুষের যেকোনো প্রকার হস্তক্ষেপের উর্ধে উঠে একমাত্র আল্লাহর দাসে পরিণত করা যায় তাহলে মানুষের এই মৌলিক অধিকার বাইরের যে কোনো হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে যেতে পারে। দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা মতবাদ ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে একমাত্র ইসলামই এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এতে সফলকাম হয়েছে। ইসলামের কাছে কুরআন ও হাদীসের আকারে একটা অপরিবর্তনীয় গাইডলাইন বা সুস্পষ্ট আইন বিধান থাকায় এটা সম্ভবপর হয়েছে। এক সময় ইসলামের প্রভাব বলয়ে বহু শতাব্দীকাল ধরে পৃথিবীব্যাপী মানুষের মৌলিক অধিকার সমুন্নত ছিল। পৃথিবীর বিগত হাজার বছরের মানুষের ইতিহাস এর সাক্ষী। যেখানে মানুষের কল্যাণের ও মানবিক অধিকার সমুন্নত রাখার দাবিদার মানুষের তৈরি মতবাদ ও চিন্তা দর্শনগুলো গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও যেকোনো অত্যাধুনিক চিন্তাদর্শন ও ব্যবস্থাই হোক না কেন তাদের দাবিকৃত ব্যবস্থার শতকরা একশো ভাগ কখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বরং যতই দিন গিয়েছে তাদের বিকৃত রূপই সামনে এসেছে। তারপর তাদের ব্যর্থতা বিশ্ব ব্যবস্থায় মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সেখানে ইসলাম তার দাবিকৃত মতাদর্শভিত্তিক মানব সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তা শতকরা একশোভাগ সফলতা সহকারে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং 'খাইরুল কুরুন' তথা মানবতার সর্বোত্তম যুগ নামে অভিহিত হয়েছিল। তারপর তাতে অবক্ষয় দেখা দিলেও পরবর্তী হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্বব্যবস্থা তার কল্যাণ ধারায় আপ্লুত হয়েছে। আজ আবার মুসলমানদের মধ্যে সেই ব্যবস্থাকে পুনরজীবিত করার প্রেরণা জাগছে। তারা আজ মানুষের নয় আবার একমাত্র আল্লাহর দাস হতে চায়। তারা মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে দিয়ে আবার একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার হরণের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে চায়।

মানুষের এই মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টাকে রুখে দেবার জন্য ফুঁসে উঠেছে পশ্চিমা ইহুদী খৃস্টবাদী চক্র। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুশেড ঘোষণা করেছে। সুদীর্ঘ পরিকল্পনার সফল বাস্তবয়ন শেষে ৯/১১ এরপর বুশ-ব্লেয়ার চক্র ইসলামের প্রতিনিধিত্বশীল মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী ঘোষণা দিয়ে তাদের এই প্রচেষ্টার সাথে যারা নেই তাদেরকে শত্রু আখ্যায়িত করেছে। বুশ-ব্লেয়ার চক্র এভাবে তাদের এই মানবিক অধিকার হরণের প্রচেষ্টাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন বিশ্ব সুস্পষ্টভাবে দুভাগে বিভক্ত : মানবিক অধিকার হরণকারী এবং মানবিক অধিকার রক্ষাকারী।

মানবিক অধিকার এখন ইতিহাসের নির্মম কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর নিবেদিত প্রাণ বান্দাদেরই এগিয়ে আসতে হবে মানুষকে তার মৌলিক অধিকার আদায় করে দেবার জন্য। এ এক লাগাতার ও কঠিন সংগ্রাম।

—আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ৯-২৪

ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

জাফর আহমাদ

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে জীবনের সব ক্ষেত্রের মতো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়গুলো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে। ব্যবসা সম্পর্কে আল কুরআনের মৌলিক কথা হলো : 'হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে ব্যবসা করবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এবং কখনো (স্বার্থের কারণে) একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।'[১] 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।'[২] আদর্শ ইসলামী শাসনের যুগে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান পুরোপুরি মেনে চলা হতো। ফলে সেখানে বর্তমান যুগের ন্যায় বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার উন্মেষ না ঘটলেও সমাজের সর্বস্তরে কল্যাণের বারিধারা প্রবাহিত ছিল। বর্তমান বিজ্ঞান ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সমাজ-সভ্যতার সকল ক্ষেত্রকে দশ কদম এগিয়ে দিলেও, অনৈতিক কর্মকাণ্ড আমাদেরকে আজো পিছনের মজবুত খুঁটিতে বেঁধে রেখেছে। দুর্নীতি ও দুরাচার আমাদের পিছু ছাড়ছে না। বিশেষত বাংলাদেশে এ সংকট আরো প্রকট। নৈতিকতার মত মৌল উপাদানকে বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত করার সুপারিশ করা যেতে পারে। কারণ নৈতিকতাহীন বিজ্ঞান পৃথিবীকে নৈরাজ্যের দিকেই ঠেলে দিয়েছে।

এখানে ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ আলহামদুলিল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক বই-পুস্তক বাজারে এসেছে। আমাদের দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু নৈতিক বিষয় তুলে ধরাই মূল লক্ষ, যেগুলোকে আমাদের ব্যবসায়ীরা কোন ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব দেন আবার কোনো ক্ষেত্রে আদৌ গুরুত্ব দেন না। বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছে তার প্রেক্ষিতে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আরো বেশি করে জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ বসে নেই, চাহিদার পাশাপাশি ইসলামী শরীয়ার আলোকে তাঁরা তথ্যের যোগান দিয়ে যাচ্ছেন। অর্থনীতি আগাগোড়া একটি ব্যবহারিক বিষয়। সাধারণ অর্থনীতির বিষয়াবলীকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো,

লেখক : জাফর আহমাদ, প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

আধুনিক সমস্যার সমাধান বা পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইসলামী অর্থনীতিও সাধারণের জন্য কিছুটা জটিল রূপ ধারণ করেছে। ফলে সে সমস্ত জটিল বিষয়ের আলোকে যুগ যুগ ধরে চলে আসা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো ইসলামের আলোকে চিহ্নিত করাও কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। ইসলামী অর্থনীতির এক বিরাট অধ্যায় হলো ক্রয়-বিক্রয় (Buying & Selling)। একে ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তিই বলা চলে। কারণ ট্রেডিশনাল অর্থনীতির ভিত্তি যদি সুদ হয় এবং একে ঘিরেই তা আবর্তিত হয়, তবে ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি ক্রয়-বিক্রয় (Buying & Selling)-কে ঘিরে আবর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্রয় বিক্রয়ের সংগা ও পরিচিতি

'বায়' শব্দটি দুই বিপরীত অর্থবোধক তথা ক্রয়-বিক্রয় উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন ইবনে উমর রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন: 'তোমাদের কেউ যেন অন্য কারো ক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।'[৩] তবে 'বায়' এর প্রকৃত অর্থ বিক্রয়। কারণ ক্রয়ের জন্য 'শিরা' শব্দ ব্যবহৃত হয়।[৪] প্রকৃত পক্ষে যেখানে ক্রয় সেখানেই বিক্রয়, আর যেখানে বিক্রয় সেখানে ক্রয়। কারণ যে ক্রয় করেছে তার নিকট আর একজন বিক্রয় করেছে এবং যে বিক্রয় করেছে তার কাছ থেকে আর একজন ক্রয় করেছে। সুতরাং 'বায়' উভয় অর্থই বোঝাবে। বায় ও শিরা এর শাব্দিক অর্থ হলো: একটি জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে বিনিময় করা। হানাফী মাযহাব মতে এর পারিভাষিক অর্থ হলো 'কাউকে একটি মালের বিনিময়ে অন্য মালের মালিক বানিয়ে দেয়া।' অন্য মতে 'পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটি মালকে অন্য মালের সাথে বিনিময় করা।[৫] অন্য মতে 'একজনের মাল অপরজনের মালের সাথে পারস্পরিক স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তিতে বিনিময় করাকে ক্রয়-বিক্রয় বলে।'[৬] ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে 'কিতাবুল বুয়ূ' বলতে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, শিল্প-উৎপাদন ও বাণিজ্যিক লেনদেন সবকিছুকেই বুঝায় ।[৭]

ব্যবসা-বাণিজ্য : আরবী তিজারাত পরিভাষাটি বহুল প্রচলিত একটি শব্দ, যার অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য। আল কুরআনের আট-নয়টি আয়াতে শব্দটির উল্লেখ আছে। ইমাম রাগিবের ব্যাখ্যায় শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মূলধন বিনিয়োগ ও ব্যবহার করা।[৮] ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়াকে মূলত তিজারাত বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। ফলে তাদের ব্যবসা মোটেই লাভজনক হয়নি। এরা সুপথপ্রাপ্ত নয়।'[৯] উল্লেখিত আয়াতে হিদায়াত ও ভ্রষ্টতাকে পণ্য ও মূল্য বলা হয়েছে এবং এ কর্মটিকে তিজারাত বলা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন এবং এটিকে আয়-উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য অনুমোদিত এবং কখনো একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।'[১০] 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।'[১১]

ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল-হারাম

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ হলো ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এ কারণে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু আজ মানুষ বিশেষত মুসলমানরা এ হালাল ব্যবসার সাথে বিভিন্নভাবে হারামের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য জিনিসে ভেজাল মেশানো, মজুদদারীর মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ফায়েদা লুটা, প্রতারণাপুর্ণ দালালীর মাধ্যমে উচ্চ দাম হাঁকা, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত লোভনীয় বিজ্ঞাপন ও কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা, মিথ্যা শপথ করা, বিক্রিত মালের দোষ ত্রুটি গোপন করা, Over ও under invoicing এর মাধ্যমে ফায়েদা হাসিল করা, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে Duty, Vat না দেয়া, চোরাই কারবার করা, সরকারের প্রাপ্য কর ফাঁকি দেয়া, মাপে বা ওজনে কারচুপি করা ইত্যাদি সকল প্রকার অপকৌশল আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ এর অর্ন্তভুক্ত। মাপে কারচুপির ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে নেবার সময় পুরোমাত্রায় নেয় এবং তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেবার সময় কম দেয়। এরা কি চিন্তা করে না, একটি মহাদিবসে এদেরকে উঠানো হবে ?'[১২]

এ ছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ওজনে ও মাপে কারচুপি করার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করার জন্য কড়া তাগিদ দেয়া হয়েছে। সূরা আনআম এ বলা হয়েছে, 'ইনসাফ সহকারে পুরোমাত্রায় ওজন ও পরিমাপ করো। আমি কাউকে তার সামর্থের চাইতে বেশির জন্য দায়িত্বশীল করি না।' আয়াত ১৫২। সূরা বণী ইসরাঈলে বলা হয়েছে, 'মাপার সময় পুরো মাপবে এবং সঠিক পাল্লা দিয়ে ওজন করবে।' আয়াত ৩৫। সূরা আর রহমানে তাকীদ করা হয়েছে : ওজনে কারচুপি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না।' আয়াত ৮-৯। মাপে কম-বেশী করার জন্য হযরত শো'আইব আ. এর সম্প্রদায় আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়।

প্রতারণাপূর্ণ বিভিন্ন ব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল স. এর বাণী নিম্নরূপ :

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স. এর নিকট বললো যে, ক্রয় বিক্রয়ে সে প্রতারিত হয়। তিনি বললেন, যখন তুমি খরিদ করবে তখন বলবে, যেন ধোঁকা না দেয়া হয়।'[১৩] আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি : 'মিথ্যা শপথের দ্বারা পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে কিন্তু এতে বরকত বা কল্যাণ লুপ্ত হয়ে যায়।'[১৪]

আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. হতে বর্ণিত। 'এক ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে মুসলমানদের ফাঁকি দেয়ার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে এবং বলে ঐ মাল সে যত দামে কিনেছে তা এখনও কেউ বলেনি। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : 'যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ও নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে।'[১৫] হযরত উমর রা. বলেছেন, 'নবী স. প্রতারণাপূর্ণ দালালী করতে নিষেধ করেছেন।[১৬] হাকীম ইবনে হিযাম রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন,

'ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং দোষ বর্ণনা করে, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'[১৭] আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, 'তোমরা (বিক্রয়ের পূর্বে) উষ্ট্রী ও বকরীর বাঁটে দুধ জমিয়ে রেখো না।'[১৮] হারাম দ্রব্য যা মানুষের সার্বিক ক্ষতি সাধন করে সে গুলোর ব্যবসা করা এ অন্যায়ের অর্ন্তভুক্ত। যেখানে অপর ব্যক্তি, পক্ষ, গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা অবশ্যই কুরআন-হাদীসের আলোকে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্যবসার গুরুত্ব

ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও বণ্টন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের গোটা জীবনের এক বিশাল অংশ দখল করে আছে এবং তা মানুষের জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বাঁচার জন্য মানুষের রিযিকের প্রয়োজন। এ রিযিক পৃথিবীতে সংগ্রাম করে আহরণ করতে হবে। রিযিক আহরণের জন্য মানুষকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া পণ্য দ্রব্যাদির আদান-প্রদান এমন একটি প্রয়োজন, যা না হলে মানব জীবন অচল হয়ে পড়ে। কারণ আমার নিকট যা আছে অন্যের নিকট তা নাই, আবার আমার যা নাই তা অন্যের নিকট আছে। তাই পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য ইসলামী শরীয়ত ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েয ঘোষণা করেছে। কুরআন ও হাদীসে ব্যবসা-বাণিজ্যকে ধন-সম্পদ বিনিময় বা আয়-উপার্জনের মাধ্যম বলা হয়েছে। হালাল উপায়ে আয়-উপার্জন করতে হলে, তার সঠিক পন্থা হলো পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা। বাতিল পন্থায় আয়-উপার্জন করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যেতে পারে।'[১৯]

নবী করিম স. ও সাহাবায়ে কেরামসহ ইসলামের বড় বড় ওলামায়ে কেরামগণ ব্যবসা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, 'বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সঙ্গী হবেন।'[২০] সুতরাং ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব অত্যধিক।

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকার

বিনিময়ের দিক থেকে 'বায়' চার প্রকার : (১) বায়'উল 'আয়ন বিল 'আয়নঃ যেমন এক ব্যক্তি কাপড় দিল, অন্যজন এর পরিবর্তে শস্য দিল। এটি বায়-এর সেই প্রক্রিয়া যাকে প্রচলিত ভাষায় বার্টার সিস্টেম বা পণ্যের বিনিময় বলে। (২) বায়উদ দায়ন বিদ দায়নঃ অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তে অর্থ প্রদান করা। যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এক টাকার নোট দিল, অপর ব্যক্তি তাকে এক

টাকার খুচরা পয়সা দিল। (৩) বায়উদ দায়ন বিল আয়নঃ একে বায় সালামও বলে। এ প্রক্রিয়ায় বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে পণ্যের দাম অগ্রিম গ্রহণ করে। (৪) বায়উল আয়ন বিদ দায়নঃ একে বায় মুতলাক (সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়) বলে। অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কেনা-বেচা হয় তাকে সাধারণ ক্রয় বিক্রয় বলে। যেমন বিক্রেতা এক মণ ধান দিল এবং ক্রেতা তাকে ৩০০ টাকা দিল।

দামের দিক থেকে বায় চার প্রকার : (১) মুরাবাহা : বিক্রেতা মালের ক্রয় মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে বিক্রি করে। (২) তাওলিয়া : ক্রেতা যে দামে ক্রয় করেছে, কোন প্রকার লাভ ছাড়া সে দামেই বিক্রি করে। (৩) ওয়াদিয়া : ক্রেতা যে দামে ক্রয় করেছে, তার চেয়ে কমদামে বিক্রি করে। (৪) মুসাওমা : ক্রেতা যে দামে ক্রয় করেছে, তা বিবেচনা না করে যে কোন মূল্যে বিক্রি করে।

হুকুমের বিবেচনায় বায় চার প্রকার : (১) সহিহ্ ও নাফেয (সঠিক ও কার্যকর ক্রয়-বিক্রয়), এর প্রক্রিয়া এই যে, উভয় পক্ষের নিকট মাল থাকতে হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতা জ্ঞান সম্পন্ন হবে, পাগল বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হবে না। চাই ক্রেতা-বিক্রেতা মূল ব্যক্তি হোক বা তাদের উকিল তথা প্রতিনিধি হোক। (২) বায় ফাসেদঃ ক্রয়-বিক্রয় কোন শর্তের অনুপস্থিতিতে ত্রুটিযুক্ত, কিন্তু শর্ত পূরণ করলে তা সঠিক হবে।(৩) বায় বাতিল : যে বিক্রয় মূলগত ও গুণগতভাবেই বাতিল এবং কোনভাবেই সংশোধনযোগ্য নয়। (৪) বায় মওকুফঃ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মাল তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করে। এ রূপ বায়ের আইনগত অবস্থা হলো-যতক্ষণ মূল মালিকের সম্মতি না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তা সঠিক ও কার্যকরি হবে না।[২১]

ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তি

ফকিহ্গণ ক্রয়-বিক্রয়ের দু'টি মৌলিক ভিত্তির কথা বলেছেন। এক, উভয় পক্ষের ইজাব ও কবুল অর্থাৎ প্রস্তাব ও সম্মতিদান। দুই, মালিকানা হস্তান্তর। অর্থাৎ ক্রেতার জন্য মালের ওপর এবং বিক্রেতার জন্য দামের ওপর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া।

ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত ও হুকুম

বায় সংঘটিত হওয়ার জন্য চার ধরনের শর্ত রয়েছে : (১) কিছু শর্ত ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সাথে সংশ্লিষ্ট (২) কিছু শর্ত মূল বেচা-কেনায় আবশ্যক। (৩) কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানের সাথে সংযুক্ত। (৪) কিছু শর্ত ক্রয়-বিক্রয়কৃত মালের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের জন্য শর্ত ২টি : (১) আকেলমন্দ তথা বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। পাগল এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য। (২) ক্রেতা-বিক্রেতার স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়া কারণ একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতা হতে পারে না। নিজের সাথে কেউ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না।

মূল ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত এই যে, ইজাবের সাথে কবুলের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অর্থাৎ বিক্রেতা যেই মূল্য প্রস্তাব করেছে, ক্রেতার সেই মূল্যে গ্রহণ করার সম্মতি থাকতে হবে।

যেমন বিক্রেতা একটি কাপড়ের মূল্য একশত টাকা প্রস্তাব করল, এখানে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার জন্য ক্রেতাকে এক শত টাকায় তা ক্রয়ের সম্মতি ব্যক্ত করতে হবে। ক্রেতা এর ব্যতিক্রম করলে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না।

ইজাব-কবুলের ক্রিয়াটি অতীতকাল বাচক হতে হবে। একজন অতীতকাল এবং অন্যজন ভবিষ্যতকাল প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে না।

ক্রয়-বিক্রয় স্থানের শর্ত এই যে, ইজাব-কবুল একই মজলিসে সংঘটিত হতে হবে।

মালের দিক থেকে শর্ত ছয়টি : (১) বিক্রিতব্য পণ্যটি বিদ্যমান থাকা অর্থাৎ অনুপস্থিত বেদখল মালের ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে না। (২) মাল হওয়া। অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে পণ্যটি মাল হতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম দ্রব্য মাল হিসাবে গণ্য হয় না যেমন শূকর, মদ। (৩) মালটি অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য হওয়া। যার কোন আর্থিক মূল্য নাই, তার ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে না। (৪) বিক্রিতব্য মালের ওপর মালিকানা বিদ্যমান থাকা। (৫) মালটি মালিকানাযোগ্য হওয়া। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি মালিকানা অযোগ্য। (৬) বিক্রিতব্য মালটি হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে।

এছাড়াও কিছু সাধারণ শর্তাবলী রয়েছে, যেমনঃ (১) ক্রয়-বিক্রয় নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্য হওয়া (২) মাল সুনির্দিষ্ট হওয়া (৩) মূল্য নির্দিষ্ট হওয়া (৪) ক্রয়-বিক্রয়ে একটা উপকারিতা থাকা চাই। কাজেই যে ক্রয়-বিক্রয়ে কোন উপকারিতা নাই, তা না করা ভাল (৫) ফাসেদকারী (ক্রটিযুক্ত) শর্ত হতে মুক্ত হওয়া (৬) বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিতব্য মাল ও মূল্য হস্তান্তরের জন্য সময় ও স্থান নির্ধারিত হওয়া। (৭) ক্রয়-বিক্রয় সুদমুক্ত হওয়া (৮) বায়ে সারফ অর্থাৎ সোনা, রূপা ও মুদ্রা বিনিময় হলে পক্ষদ্বয় পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্বেই বিনিময়কৃত মাল পরস্পর হস্তগত হওয়া।(৯) বায় সালামের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল শর্ত বিদ্যমান থাকা।[২২]

ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনে শব্দ

ফকীহগণ বলেন, তামলিক (মালিক বানোনো) ও তামালুক (মালিক হওয়া)-এর অর্থ জ্ঞাপক যে কোন শব্দ দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়। চাই তা অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ হোক বা বর্তমানকাল জ্ঞাপক। চাই তা বাংলা ভাষায় বলা হোক বা অন্য কোন ভাষায় বলা হোক, তবে ভাষা উভয়ের বোধগম্য হতে হবে। অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়া হলে এ ক্ষেত্রে বর্তমান-এর নিয়ত করা আবশ্যক নয়। বরং নিয়ত ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। ক্রেতা বা বিক্রেতার কোন একজন বলল, আমি বিক্রি করলাম তারপর অপরজন বলল, আমি ক্রয় করলাম, এতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়ে যাবে।

সুদ ও ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য

কুরআন-হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে কেউ কেউ জাহেলী যুগের পৌত্তলিকদের মতই উক্তি করে থাকে যে, ক্রয়-বিক্রয় লব্ধ মুনাফা তো সুদেরই অনুরূপ। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাফল্য ও অগ্রযাত্রায় প্রায়ই উল্লেখিত মন্তব্য করা হয়। বিশ্ব অর্থনীতি ও ব্যাংক

ব্যবস্থা সুদনির্ভর বা সুদী প্রভাব বলয়ে বেড়ে উঠেছে। তাছাড়া দীর্ঘকাল ইসলামী অনুশাসনের অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী আর্থিক লেনদেনও চালু নেই। ফলে এ ক্ষেত্রে মানুষের ধারণা ও জ্ঞান এতই সীমিত যে. তাদের কাছে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং যেন একটি কাল্পনিক বিষয়। প্রচলিত অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম দ্বারা তাদের চিন্তা ও চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ইসলামী অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুবিচার ও সুষম বন্টন নিশ্চিত করে সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। এ লক্ষে ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়কে করেছে হালাল আর সুদকে করেছে হারাম। আল্লাহ বলেন, 'যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলেঃ ব্যবসা তো সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই উপদেশ পৌছে যায় এবং সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে। আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী।'[২৩]

এক শ্রেণীর লোক বলে, তারাও ১৫%, আমরাও ১৫% তফাৎ কোথায়? প্রকৃতপক্ষে শতকরা হারের সাথে জায়েয-নাজায়েযের মানদণ্ড সম্পর্কিত নয়, মানদণ্ডের সম্পর্ক হলো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সাথে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল এবং বাই-সালাম পদ্বতিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে অধিক স্বাচ্ছন্দবোধ করছে। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক কেনা-বেচা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পরিচালনা করে থাকে। যা প্রচলিত সুদী ব্যাংকের প্লেজ ও হাইপোথিকেশনের মতো মনে হয়। উল্লেখ্য প্লেজ ও হাইপোথিকেশন দুটি জায়েজ পদ্ধতি। ফলে প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য সহজে বুঝা যায় না।

সুদ : সুদ হারাম। কারণ এটি একটি শোষণের হাতিয়ার। সুদ মানুষকে বিভিন্নভাবে খারাপ কাজে ঠেলে দেয়। কার্পণ্য, হৃদয়হীনতা. স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার অসৎ গুণাবলী সৃষ্টি করে। তাই কুরআন ও হাদীসে এটিকে ধ্বংসাত্মক উপাদান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সুদের সংগা

সুদের আরবী শব্দ রিবা যার অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। পারিভাষিক অর্থে 'নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ দেওয়ার পর তার উপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অতিরিক্ত কিছু অর্থ আদায় করলে এ অতিরিক্ত অর্থই সুদ। তদ্রুপ একই প্রজাতির খাদ্যশস্য কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ নিলে এ বেশিটুকুই সুদ। প্রথমটি রিবা-নাসিয়া এবং শেষোক্তটি রিবা ফদল।

রিবা নাসিয়া হলো : ঋণ নগদ অর্থে অথবা দ্রব্য-সামগ্রীর আকারে যেভাবেই হোক তার উপর সময়ের ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হলে সেই অতিরিক্ত অর্থ বা দ্রব্যকে নাসিয়া সুদ বলা হয়।

রিবা ফদল : একই প্রজাতির খাদ্যশস্য নগদ বিনিময়ের ক্ষেত্রে একপক্ষ যদি অতিরিক্ত কিছু দেয় তবে তাকে রিবা ফদল বলা হয়। যেমন দুই কেজি নিম্নমানের খেজুরের সাথে এক কেজি ভালো খেজুরের বিনিময় করা। রসূলুল্লাহ স. এ ধরনের লেনদেনকে হারাম গণ্য করতেন।

রিবা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ফয়সালা নিম্নরূপ :

আল-কুরআন :

'যে সুদ তোমরা দিয়ে থাকো, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না। আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।'[২৪]

'তাদের সুদ গ্রহণ করার জন্য যা গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য।[২৫]

হে ঈমানদারগণ ! এ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো । এবং আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।'[২৬]

যারা নিজেদের ধন সম্পদ দিনরাত গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে , তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন ভয় ও দুঃখ নেই। কিন্তু যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে: ব্যবসা তো সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই উপদেশ পৌছে যায় এবং সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে। আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন। আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দুস্কৃতকারীকে পছন্দ করেন না।' [২৭]

'ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো । কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তাহলে তোমরা নিজের মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।'[২৮]

রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, সুদের গুণাহ্র সত্তরটি স্তর রয়েছে। এর সর্বনিম্ন স্তর হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য।'[২৯] আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। একবার বিলাল রা. ভাল জাতের খেজুর নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসব কোথা থেকে আনলে? বিলাল রা. জবাব দিলেন, আমাদের নিকট নিকৃষ্টমানের খেজুর ছিল, তার দুই সা পরিমাণ দিয়ে উৎকৃষ্ট এক সা খেজুর নিয়ে এসেছি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, উহ্ ! এ তো নির্ভেজাল সুদ! এমন

কাজ কখনো করো না। তোমরা ভাল খেজুর কিনতে চাইলে আগে তোমার খেজুর বিক্রি করো, পরে তার মূল্য দিয়ে ভালো খেজুর ক্রয় করো।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়

ব্যবসা বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জিত অতিরিক্ত অংশকে মুনাফা বলা হয়। এ ধরনের মুনাফাকে ইসলামে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে মুনাফার বিনিময় হয়। এখানে একজন অন্যজনের প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য সময়, মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করে থাকে এবং তার বিনিময় দান করে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অর্থ দ্রব্যে এবং দ্রব্য অর্থে রূপান্তরিত হয়। এ রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু লোকের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হয়, অর্থের প্রবাহ চালু হয় এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে দেশে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে, ব্যবসার নতুন নতুন দিগন্ত খুলে যায় এবং উন্নয়নে গতি সঞ্চারিত হয়।

সংক্ষেপে সুদ ও লাভের পার্থক্য নিম্নে পেশ করা হলো :

০ মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার সাথে, সুদের সম্পর্ক নগদ ঋণ ও সময়ের সাথে। পুঁজি বিনিয়োগের ফলে যে অতিরিক্ত আয় হয় সেটি মুনাফা। নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে পরিশোধের শর্তে ঋণ দেয়ার পর পূর্ব নির্ধারিত হারে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থই সুদ।

০ মুনাফা বিক্রেতার পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগের ফল, কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতার কোন শ্রম বিনিয়োগ করতে হয় না ।

০ মুনাফা অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত, কিন্তু সুদ নির্ধারিত ও নিশ্চিত। ব্যবসায়ী জানেনা তার ব্যবসায় আদৌ লাভ কি ক্ষতি হবে। লোকসান সার্বক্ষণিক তাকে তাড়া করে ফেরে। কিন্তু সুদী মহাজন ঋণ গ্রহীতা মরল কি বাঁচল তাতে তার কিছু যায় আসে না। আসল সহ সুদ তার ঘরে ফিরে আসবেই।

০ বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে যতই মুনাফা আদায় করুক না কেন সেটা একবারই আদায় করতে পারবে, কিন্তু সুদ একই মূলধনের উপর বারবার নির্ধারণ এবং আদায় করা যায় (যাকে আমরা চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে থাকি)।

০ মুনাফায় লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়, কিন্তু সুদে কোন ঝুঁকি নাই।[৩০]

সুতরাং প্রতিটি মুসলমানকে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য সম্পর্কে জানতে হবে। ইসলাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে কথা বলা বা আমল করাকেই পছন্দ করে। কারণ অনুমানভিত্তিক কথাটি যদি সরাসরি আল্লাহর কথার বিপরীত হয় তবে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যাবে। অর্থনীতির জটিল তথ্যগত জ্ঞান অর্জনের জন্য গভীরে প্রবেশ করতে না পারলেও ঈমান রক্ষার তাগিদে অন্তত ক্রয়-বিক্রয়, মুনাফা ও সুদের পার্থক্যটুকু আত্মস্থ করা একান্ত প্রয়োজন।

মূল্য নির্ধারণ বা দামনীতি

সাধারণ অবস্থায় সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া ঠিক নয়। কারণ এতে উৎপাদনকারীর উৎপাদনে আগ্রহ ও উদ্দীপনা কমে যায়। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : 'তোমরা মূল্য বেঁধে দিও না।

কেননা আল্লাহ তাআলাই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন, হ্রাস-বৃদ্ধি করেন এবং রিযিক প্রদান করেন।[৩১] হযরত আনাস রা. বলেন, নবী করীম স. এর যামানায় একবার দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে লোকেরা বললো হে আল্লাহর রসূল! আপনি দ্রব্যমূল্য ধার্য করে দিন। নবী করীম স. বললেন, আল্লাহ তাআলাই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন, হ্রাস-বৃদ্ধি করেন এবং রিযক প্রদান করেন। আমি আশাবাদী যে, আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবো যে, রক্তপাত ও আত্মসাৎ করে জুলুম করেছি বলে তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে কোন কিছুর দাবি উত্থাপন করতে সক্ষম হবে না।[৩২]

মূল্য বিক্রেতার অধিকার। তাই বলে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ যেনতেনভাবে মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন না। যদি এমনটি কেউ করেন তবে উল্লেখিত হাদীসের আলোকে আত্মসাৎকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবেন। এ ধরনের অসাধু, স্বেচ্ছাচারী উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ যদি সীমালংঘনপূর্বক অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং মূল্য নির্ধারণ ছাড়া ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব না হয় তাহলে সরকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে।[৩৩] মূল্য নির্ধারণের পর কেউ যদি সীমালংঘন করে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে তাহলে এ বিক্রয় যথার্থ হবে, তবে আইন লংঘনের দায়ে সে দোষী সাব্যস্ত হবে।[৩৪] ব্যবসার লক্ষ্যই হলো মুনাফা লাভ। ইসলাম তা অর্জন নিষিদ্ধ করে না, ব্যবসায়ীকে মুনাফা থেকে বঞ্চিত করে না। কেননা মুনাফা পাওয়ার অধিকার না থাকলে কেউ-ই ব্যবসা করতো না। ফলে জনগণের জীবন-জীবিকা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

তবে, রবিহুল ফাহ্শ অর্থাৎ অত্যধিক, সীমাহীন মুনাফা (Excessive and extorbitant profit) গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা, তা এক ধরনের শোষণ, অন্যদের ওপর জুলুম। শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ মুনাফা হচ্ছে ক্রয় মূল্যের এক ষষ্ঠাংশের সীমার মধ্যে যা থাকবে। আর এ মতও দেয়া হয়েছে যে, মুনাফা ক্রয় মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের সীমার মধ্যে থাকা উচিত। কোন ফিক্হবিদ রায় দিয়েছেন, ব্যবসায় অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকদের বিবেচনায় যা স্বাভাবিক, তা-ই বৈধ মুনাফা। পণ্যমূল্য জানে না এমন ক্রয়কারীর নিকট থেকে বেশি মূল্য আদায় করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আইনের দৃষ্টিতে তা ধোকা, প্রতারণা। এ কাজ যে করে ফিক্হবিদগণ তার নাম দিয়েছেন 'আল-মুস্তারসিল'। এ সংক্রান্ত হাদীস হচ্ছে : যে মুসলিমই অপর মুসলিমের নিকট থেকে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা নিল সে তাকে প্রতারিত করলো, সে বড়ই অপরাধী।[৩৪] অপর হাদীসে বলা হয়েছে, ব্যবসায়ী যদি সীমাতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করে এ সুযোগে যে, ক্রেতা পণ্যের প্রকৃত মূল্য জানে না, তাহলে এই অতিরিক্ত পরিমাণের মূল্য সুদ পর্যায়ে গণ্য হবে।[৩৫]

আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, 'মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তা হালাল বা হারাম পন্থায় অর্জিত হচ্ছে কি না তা মোটেই চিন্তা করবে না।'[৩৬] এ আয়াতে 'অন্যায়ভাবে' বলতে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক দিক দিয়েও সম্পূর্ণ অবৈধ। আমরা আমাদের সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সকল প্রতারণা লক্ষ করি তা অন্যায় এবং আল্লাহর রসূল তা নিষিদ্ধ করেছেন।

এতক্ষণ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ বা দামনীতির যে আলোচনা করা হলো তার আলোকে নিম্নে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো :

(ক) বিভিন্ন কল-কারখানা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমের সঠিক মূল্য দেয়া হয় না। আর্থিক অসচ্ছলতা, কর্মসংস্থানের অভাব ও শ্রমের সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকরা নিতান্তই অল্প মজুরীতে শ্রমিক-কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়। শ্রমিক-কর্মচারীর স্বল্প বেতন দেয়ার ভিত্তিতে অর্জিত আয় এবং প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় নিজেরা বিত্ত-বৈভবের পাহাড় গড়ছে। কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারীরা চিরদিন অবহেলিত মানুষের কাতারেই রয়ে যাচ্ছে। এটি ইসলামী শ্রমনীতিতে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বরং নিরেট পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী নীতির ফল।

তাছাড়া বাজার মূল্যের চেয়ে অত্যন্ত নগণ্য বেতন ও মজুরীটুকুও সঠিক সময়ে পরিশোধ করা হয় না বরং মাসের পর মাস বাকি পড়ে থাকে। এ ধরনের কোন ব্যবস্থাই ইসলাম সমর্থিত নয়। কারণ শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকানোর আগেই মজুরী পরিশোধের তাগিদ দিয়েছেন মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স.। ইসলামের দামনীতি অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীর শ্রমের সঠিক বাজার মূল্য থেকে কম দেয়া অংশটুকু প্রতিষ্ঠানের মালিকদের আয়-উপার্জনকে অবৈধই করে এবং অবশ্যই তিনি সূরা আন্ নিসার ২৯ নং আয়াতে উল্লেখিত 'অন্যায়ভাবে' ও রসূলুল্লাহ স. এর হাদীসের 'আত্মসাৎ' এর অপরাধের আওতাভুক্ত হবেন। কারণ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সুষমবন্টন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের শ্রমের সঠিক মূল্য নির্ধারণ ও পরিশোধ করা হয়নি। তাছাড়া এ ধরনের মালিকরা আল্লাহ তাআলার নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণিত ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, 'লোকদের থেকে নেবার সময় পুরোমাত্রায় নেয় এবং তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেবার সময় কম দেয়।' সত্যিই শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়ার সময় এরা পুরোমাত্রার চেয়েও বেশি আদায় করে থাকে। কিন্তু সুযোগ-সুবিধার বেলায় তাদের হাত গলদেশে ঝুলিয়ে রাখে। তাছাড়া কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ১৬/১৮ ঘণ্টাও বাধ্যতামূলক কাজ করানো হয় যা সমাজবাদীদের বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এগুলোতে ওভার টাইমের মূল্য খুবই কম। এদের কঠিন হৃদয়ের কাছে রসূলুল্লাহ স. এর আরেকটি বাণী পেশ করছি। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের সেবকরা তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীনস্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেনো তার ওপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপানো হয়, তবে সে তা সম্পাদনের তাকে সাহায্য করে।'[৩৭] এ হাদীসের আলোকে প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের একটা অংশ শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্য। এ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(খ) বিভিন্ন ইসলামী কো-অপারেটিভ সমিতি স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা বা থানা পর্যায়ের সমবায় অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে অনেকটা ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিনা জামানতে ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক কিস্তি পরিশোধের শর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। বিনিয়োগের প্রত্যক্ষ লাভের হার শতকারা ২০% থেকে ২৮%। বিনিয়োগের টাকা দৈনিক কিস্তিতে আদায় করা হলেও লাভের হারে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় না। ফলে দৈনিক কিস্তি আদায়ের কারণে এর শতকরা হারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০% থেকে ৫৬%। তাছাড়া দৈনিক আদায়কৃত টাকার সাথে সাথে আবার অন্যত্র বিনিয়োগ করা হয়। ঘূর্ণায়মান এ পুঁজির লাভের হার হিসাব করলে এর শতকরা হার ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিগুণ বা তার চেয়েও বেশি হবে। এরা ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ/বিনিয়োগের দীর্ঘসূত্রিতা এবং নিজেদের ঋণ/বিনিয়োগের সহজলভ্যতা, সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্যতা ও অশিক্ষিত বা আধাশিক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গরীব ব্যবসায়ীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। দুর্বলতার জন্য এ সকল ব্যবসায়ী কোনদিন খোঁজ নিয়ে দেখে না বা এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের জানায় না যে, কতটুকু লাভ তাদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। যে কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা বা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতারণার শামিল। এ সম্পর্কিত হাদীস হচ্ছে: যে মুসলিমই অপর মুসলিমের নিকট থেকে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা নিল সে তাকে প্রতারিত করলো, সে বড়ই অপরাধী।'[৩৮] অপর হাদীসে বলা হয়েছে, ব্যবসায়ী যদি সীমাতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করে এ সুযোগে যে, ক্রেতা পণ্যের প্রকৃত মূল্য জানে না, তাহলে এ অতিরিক্ত মূল্য সুদের পর্যায়ে গণ্য হবে।[৩৯]

'চার ইমাম কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায় নগদ মূল্যের চেয়ে কিছুটা বেশি গ্রহণ জায়েয বলেছেন। তবে এটিরও একটি সীমা থাকা প্রয়োজন। আর এ ব্যাপারে চার ইমামের শর্ত হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসেই ক্রেতা ও বিক্রেতাকে চূড়ান্ত ফয়সালা করে নিতে হবে যে, ক্রয়-বিক্রয় নগদ মূল্যে করা হচ্ছে না কি বাকিতে। যাতে মূল্যের বিষয়টি অজ্ঞাত থেকে না যায়।'[৪০]

ইসলামী ব্যাংকিং এর সাফল্যের কারণে ইদানিং কো-অপারেটিভ সমিতিগুলোকেও ইসলামী নাম দিয়ে লাইসেন্স নিতে দেখা যায় এবং তারাও ইসলামী শরীআর আলোকে ক্রয়-বিক্রয় (Buying & Selling) করে থাকে। সাধারণ কো-অপারেটিভ গুলো যেহেতু সুদনির্ভর তাই মানুষকে শোষণ করার জন্য তারা যে কোন কৌশলই অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু ইসলামী কো-অপারেটিভগুলোর ইসলামের মূল্যনীতি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী।

(গ) শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটির পরিপূর্ণ উন্মেষ ঘটেছে বিগত দুটি সরকারের আমল থেকে। আগেও শেয়ার বেচা কেনা হতো কিন্তু সাধারণের মধ্যে এর এতটা ব্যাপকতা ছিল না। বর্তমানে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে এর প্রসার ঘটেছে যে এদের অনেকেই শেয়ার কি জিনিস, এর স্বরূপই বা কি, ইসলামে এর অনুমোদন রয়েছে কিনা, এর কিছুই জানে না। কোম্পানীর শেয়ারকে আরবীতে

সাহ্ম বা হাসাস বলা হয়। অর্থ অংশ। কেউ যদি শেয়ার ক্রয় করে তবে শেয়ার সার্টিফিকেট এ কথার প্রমাণ যে, উক্ত ব্যক্তি এই কোম্পানীর বিশেষ একটি অংশের মালিক। কয়েকজনে মিলে অংশীদারী ব্যবসা করা হয়। কিন্তু বড় ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য কয়েকজনের পুঁজি যথেষ্ট নয় বিধায় কোম্পানী গঠন করে বাজারে শেয়ার ছাড়া হয় অর্থাৎ কোম্পানীর অংশীদার হওয়ার জন্য আহবান জানানো হয়। যারা আহবানে সাড়া দিয়ে শেয়ার ক্রয় করে তারা কোম্পানীর অংশীদার হিসাবে গণ্য হয়। এ অংশীদারগণ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে শেয়ার অন্যত্র বিক্রি করতে চায় বিধায় ষ্টক মার্কেট গড়ে উঠেছে। তাছাড়া জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী নামে শরীকানা ব্যবসার পদ্ধতিও চালু আছে।

কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। তবে শর্ত থাকে যে, হালাল কাজের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানী হতে হবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হারামের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকলে, তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা এবং তা থেকে প্রাপ্ত ডিভিডেন্ট বা লভ্যাংশ জায়েয হবে না। যেমন মদ তৈরির কারখানা, সুদভিত্তিক ব্যাংক ও সুদভিত্তিক বীমা কোম্পানী ইত্যদির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় এবং তা থেকে প্রাপ্ত লাভ বা ডিভিডেন্ট জায়েয হবে না।[৪১] কোন ব্যক্তি যদি ষ্টক মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয় করে তবে এ ক্ষেত্রে তাকে ৪টি শর্তের দিকে নজর রাখতে হবে। (১) কোম্পানীর যাবতীয় কারবার হালাল হতে হবে। কোম্পানী কোনরূপ হারাম কাজের সাথে জড়িত হতে পারবে না। (২) কোম্পানীর গোটা অর্থসম্পদ (Liquid Assets) নগদ হতে পারবে না বরং তার কিছু স্থায়ী সম্পদ থাকা আবশ্যক। কোম্পানীর যদি কোন স্থায়ী সম্পদ না থাকে তবে শেয়ারসমূহ তার অভিহিত মূল্যের চেয়ে কম বা বেশি মূল্যে বিক্রি করা জায়েয হবে না। (৩) কোম্পানী যদি নিজেদের ফান্ড বাড়ানোর জন্য ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে অথবা নিজেদের অতিরিক্ত অর্থ সুদী ব্যাংকে জমা রাখে তবে এমতাবস্থায় কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করা জায়েয হবে না। (৪) মনে রাখতে হবে, কোম্পানীর মূল ব্যবসা যদি হালাল হয় এবং পরবর্তীতে এর মধ্যে যদি কোন সুদী পয়সা এসে যায় তবে লভ্যাংশ বন্টনের সময় যতটুকু সুদ ঢুকেছে তা পৃথক করে লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হবে। এবং সুদের অংশ বিত্তহীন গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে।[৪২]

(ঘ) কোন কোন প্রপার্টিজ ও এপার্টমেন্টের ব্যবসা যার মধ্যে প্রতারণা, প্রতারণাপূর্ণ দালালী, মিথ্যা শপথ, লোভনীয় কৃত্রিমতা অবলম্বন ও দোষত্রুটি গোপন করার মত নিষিদ্ধ কাজ রয়েছে। কোন কোন কোম্পানী পত্রিকায় প্রকাশিত লক্ষ লক্ষ টাকার বাহারী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণকে তাদের প্রতারণার জালে আটকিয়ে বছরের পর বছর ঘুরাতে থাকে। বুকিং দেয়ার পর বিজ্ঞাপনে প্রতিশ্রুত বিভিন্ন লোভনীয় সুযোগ-সুবিধার কোন একটিও দেখা মেলে না। হাতে গোনা কিছু প্রপার্টিজ ও কোম্পানী সততার পরিচয় দিলেও, একটি বিষয় প্রায় সকলের মধ্যেই সাধারণভাবে দেখা যায়। সেটি হলো: ডাউন পেমেন্ট বা বুকিং মানি, মাটি ভরাট, রাস্তা-ঘাট, গ্যাস-বিদুৎ ইত্যাদির নাম করে গ্রাহকের কাছ থেকে অগ্রীম টাকা আদায় করা হয়। শত শত ব্যক্তির কাছ থেকে নেয়া এ টাকায় অন্য একটি প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে, এভাবে সেখান থেকেও উল্লেখিত অজুহাতে

টাকা আদায় করা হয়। বছরের পর বছর চলে যায়, জনগণের টাকায় আরো ৪/৫টি প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়, কিন্তু কোন প্রজেক্টের কাজ শেষ হয় না। বিভিন্ন প্রজেক্ট থেকে নেয়া টাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২/১ বছরে আঙ্গুল ফুলে বিরাট গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক বনে যান। অথচ তিন কাঠার প্লটের মালিকটি ঘুমের অঘোরে পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেয়া প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে সারি সারি বাড়ির মাঝে নিজের বাড়িটি খুঁজে ফেরে। এভাবে স্বপ্নে স্বপ্নে কেটে যায় গ্রাহকদের দুঃস্বপ্নের প্রহরগুলো।
(ঙ) শুফাআ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ আইনটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কার্যকর না থাকায় আজকাল জমি ক্রয়-বিক্রয়ে অনেক জুলুম-নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য সামাজিক ফেতনা-ফাসাদ থেকে শুরু করে অনেক মূল্যবান প্রাণহানিও ঘটতে দেখা যায়। জমির মালিক এবং প্রতিবেশী উভয়ের পক্ষ থেকেই এ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক দিকে জমির মালিক প্রতিবেশীকে বিপদে ফেলার নিমিত্তে তাকে না জানিয়ে অন্যত্র জমি বিক্রি করে দেয়। ফলে নতুন প্রতিবেশী পুরাতন প্রতিবেশীর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর তখনই সৃষ্টি হয় বাক-বিতণ্ডা থেকে শুরু করে পেশী শক্তির প্রদর্শন। পর্যায়ক্রমে এটি সমাজকেও আক্রান্ত করে। ব্যক্তি সীমানা পেরিয়ে সমাজের বিবেকবান এবং বিবেকহীন লোকগুলোকে উভয় পক্ষেই এনে দাড় করায়। সামাজিক বিশৃংখলা তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আবার এমনটিও লক্ষ করা যায় যে, কোন কোন প্রতিবেশী জমির কম মূল্য হাঁকিয়ে অন্য প্রতিবেশীর জমি বিক্রিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাইরের কোন খরিদ্দার এলে তাকে হুমকী ধমকী দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো প্রতিবেশী যেন স্বল্প মূল্যে তার কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এবং শেষাবধি বিক্রেতাকে সেটিই করতে হয়। অত্যন্ত কমদামে বিক্রি করে তাকে চলে যেতে হয়। ফলে সে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার এমনটিও লক্ষ করা যায় যে কোন ক্রমে প্রতিবেশী অন্যত্র বিক্রি করে দিলেও, নতুন প্রতিবেশীটি পুরাতন প্রতিবেশীর নির্যাতনের শিকার হয়। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। শুফাআ আইনের অনুপস্থিতিতে এ সমস্ত চিত্র আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে স্থায়ী প্রকৃতির কোন কিছু বিক্রি করার সময় অবশ্যই সর্বপ্রথম শাফী তথা অংশীদার ও প্রতিবেশীকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হবে। তাছাড়া দূরবর্তী কোন ক্রেতার জমি ক্রয় করার সময় শুফআর বিষয়টি বিবেচনায় এনে যাচাই করা উচিত। তাতে অনেক অনাকাংখিত বিষয় এড়ানো সম্ভব হবে। হযরত যাবের রা. বলেন, প্রতিটি অবিভক্ত অংশীদারী সম্পত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুফআ নির্ধারণ করেছেন। চাই তা ঘর হোক কিংবা বাগান। কারো পক্ষে হালাল নয় যে, তার অংশীদারকে অবগত না করে তা বিক্রি করে। সে ইচ্ছা করলে তা রেখে দেবে, অন্যথায় ছেড়ে দেবে। আর যদি তাকে না জানিয়ে বিক্রি করে তাহলে সে সকলের চেয়ে বেশি হকদার।'
(চ) মাপে বা ওজনে কমবেশী করাও আয়াতে উল্লেখিত 'অন্যায়ভাবে' এর অন্তর্ভুক্ত। ওজনে কমবেশি করা আমাদের সমাজে অনেকটা মহামারীর মতই সংক্রমিত। অথচ কুরআন ও হাদীসে ওজনে কমবেশি করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ধমকি দেয়া হয়েছে।

প্রমাণপঞ্জি :

১. আল-কুরআন, সূরা আন্ নিসা, আয়াত ২৯।
২. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫।
৩. জামে তিরমিযী ও হাকিম।
৪. আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা, ১ম খণ্ড ১ম সং, কুয়েত ১৪০৭ হি।
৫. হিদায়া, বুয়ু পর্ব, বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (রঃ)।
৬. আলমগীরী ৩য় খণ্ড।
৭. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল, সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা প্রকাশন, মে-২০০৫।
৮. মুফরাদাত,ইমাম রাগিব ইস্পাহানী।
৯. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-১৬।
১০. আল-কুরআন, সূরা আন্ নিসা, আয়াত ২৯।
১১. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫।
১২. আল কুরআন,সূরা আর্ মুতাফফিফীন, আয়াত ১-৬।
১৩. সহীহ্ বুখারী ।
১৪. সহীহ্ বুখারী ।
১৫. সহীহ্ বুখারী ।
১৬. সহীহ্ বুখারী ।
১৭. সহীহ্ বুখারী ।
১৮. সহীহ্ বুখারী ।
১৯. আল-কুরআন, সূরা আন্ নিসা, আয়াত ২৯।
২০. জামে তিরমিযি ও ইবনে মাজা।
২১. হিদায়া বুয়ু পর্ব।
২২. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল, সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা প্রকাশন, মে-২০০৫।
২৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-২৭৫।
২৪. আল কুরআন, সূরা রুম, আয়াত-৩৯১।
২৫. আল কুরআন, সূরা আন্-নিসা আয়াত-১৬১।
২৬. আল কুরআন, সূরা আল্-ইমরান, আয়াত-১৩০।
২৭. আল কুরআন,সূরা বাকারা, ২৭৫-২৭৬।
২৮. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-২৭৮ ও ২৭৯।
২৯. ইবনে মাজাহ।
৩০. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী র.।
৩১. সুনানে আবু দাউদ ও জামে তিরমিযি।

৩২. মিশকাত, জামে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ।

৩৩. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল, সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা প্রকাশন, মে-২০০৫।

৩৪. হিদায়া বুয়ু পর্ব ও আলমগীরী ৩য় খণ্ড।

৩৫. আল-কুরআনের অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, পৃষ্টা ৫৮৯, ইফাবা গবেষণাঃ ও ইফাবা প্রকাশনা, এপ্রিল-১৯৯০।

৩৬. আল-কুরআনের অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, পৃষ্টা ৫৮৯, ইফাবা গবেষণাঃ ও ইফাবা প্রকাশনা, এপ্রিল-১৯৯০। তারা এটি তাফসীরে মরাগী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্টা ৬৪ থেকে উদ্ধৃতি করেছেন।

৩৭. সহীহ্ বুখারী ।

৩৮. সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম ।

৩৯. আল-কুরআনের অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, পৃষ্টা ৫৮৯, ইফাবা গবেষণাঃ ও ইফাবা প্রকাশনা, এপ্রিল-১৯৯০।

৪০. আল-কুরআনের অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, পৃষ্টা ৫৮৯, ইফাবা গবেষণাঃ ও ইফাবা প্রকাশনা, এপ্রিল-১৯৯০। তারা এটি তাফসীর মারাগী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪ থেকে উদ্ধৃতি করেছেন।

৪১. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল, সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা প্রকাশন, মে-২০০৫।

৪২. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল, পৃষ্টা-৫৭, সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা প্রকাশন, মে-২০০৫।

৪৩. সহীহ্ মুসলিম।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ২৫-২৯

পানাহারে হালাল ও হারাম

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

ভূমিকা

জীবন বাঁচানোর তাগিদে মানুষ ও সকল প্রাণীকুলকেই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হয়। জীবন ধারণের জন্য যার যে রিযিকের প্রয়োজন, মহান রাব্বুল আলামীন তার সুষম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই'।[১]

'এমন বহু জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মজুদ রাখে না। আল্লাহই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিযিক দান করেন।'[২]

'আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন।'[৩]

মানুষ পৃথিবীতে খাদ্য ও পানীয় হিসাবে যা কিছু আহার করে, তার সবটাই ইসলামী শরীয়তে হালাল নয়। বরং এসবের মধ্যে যা কিছু পবিত্র ও কল্যাণকর তা-ই শুধু আল্লাহ্ হালাল করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর।'[৪]

বৈধ সম্পত্তি হিসেবে হালাল রিযিকের সঠিক সংরক্ষণ এবং এর মাধ্যমে মানব জীবনের সুরক্ষা- এ দুটি বিষয়কে ইসলাম মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার (আদ-দারুরিয়াত আল-খামস) দু'টি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৫] অতএব আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য পানাহারের ক্ষেত্রে হালাল এবং হারাম কি কি তা জানাও সমভাবে জরুরী।

হালাল ও হারামের পরিচয়

হালাল হচ্ছে হারামের বিপরীত। এমন বস্তু যা নিষিদ্ধ নয়, বরং মুবাহ ও অনুমোদিত। অন্য কথায় শরীয়ত প্রণেতা যা করার অনমুতি দিয়েছেন কিংবা যা করতে নিষেধ করেননি।[৬]

অন্যদিকে হারাম হচ্ছে এমন বস্তু যা শরীয়ত প্রণেতা স্পষ্টভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যা করলে পরকালে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। অনেক সময় দুনিয়ায়ও দণ্ড ভোগ করতে হবে।[৭]

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর।

একমাত্র আল্লাহই হালাল-হারাম এর সিদ্ধান্ত দিতে পারেন

পানাহারে হালাল ও হারামের বিষয়টি ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহকে একমাত্র রব ও একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারটি এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার রয়েছে হালাল-হারাম সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার। এ ব্যাপারে সৃষ্টির কাউকে কোন কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি। আল্লাহর বান্দাদের উপর কোন কিছু হারাম করার কিংবা হালাল বলে চালিয়ে দেয়ার কোন অধিকার পৃথিবীর কোন আলেম, পীর-দরবেশ, রাজা-বাদশাহ কিংবা নেতা কারোরই নেই। যদি কেউ তা করার দুঃসাহস করে তবে তা হবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন করা এবং তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করার নামান্তর। আল্লাহ বলেন, 'তাদের কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের এমন বিধান রচনা করে দিচ্ছে, যার জন্য আল্লাহ কোন অনুমতিই দেননি?'[৮]

ইহুদী ও খৃস্টানগণ হালাল-হারাম নির্ধারণের নিরংকুশ কর্তৃত্ব দিয়েছিল তাদের পাদ্রী ও পণ্ডিতদের। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে এতে তাদেরকে রব বানিয়ে নেয়ার মতো অপরাধ হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

'তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের পাদ্রী, পণ্ডিতবর্গ ও মরিয়ম তনয় মাসীহকে রব বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করতে। প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই। তারা তাঁর সাথে যে শিরক করছে তিনি তা থেকে পবিত্র ও তার উর্ধে।[৯]

বিখ্যাত হাতিম তাঈ-এর পুত্র 'আদী ইবনে হাতিম খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন নবী করীম স.-কে উক্ত আয়াতটি পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে রসূল! তারা তো তাদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের ইবাদত করেনি? রসূল স. জবাবে বললেন, এ পাদ্রী-পণ্ডিতরাই কি ওদের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণ করে দেয়নি? আর ওরা তাই সাগ্রহে ঐকান্তিকভাবে মেনে নিয়েছে। কুরআনে এটাকেই বলা হয়েছে ওদের ইবাদাত অর্থাৎ এরূপ করাই ইবাদাত।[১০] অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী স. উপরোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'তারা তাদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের সরাসরি ইবাদত বন্দেগী করত না বটে, কিন্তু পাদ্রী-পণ্ডিতরা তাদের জন্য কোন জিনিসকে হালাল ঘোষণা করলে তারা সেটাকে হালাল রূপে গ্রহণ করত এবং কোন জিনিসকে তাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করলে সেটাকে হারামরূপে মেনে নিত।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, কাউকে হালাল-হারাম নির্ধারণের অথরিটি দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে রব হিসাবে স্থির করা। আর নির্ধারিত এ হালাল-হারামের ভিত্তিতে আমল করা প্রকারান্তরে সে নির্ধারকদের ইবাদাত করার শামিল। অথচ ইবাদাত একমাত্র আল্লাহকেই করতে বলা হয়েছে। অতএব হালাল হারাম নির্ধারণের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়া কোন তাওহীদবাদী ব্যক্তির কাজ নয়, এ হচ্ছে শিরকে লিপ্ত লোকদের কর্মকাণ্ড। সেসব লোকদের লক্ষ করে আল্লাহ বলছেন,

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন, তোমরা কি তার কিছু হালাল এবং কিছু হারাম করে নিয়েছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদের তা করার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলছ?'[১১]

একটি হাদীসে কুদসীতে নবী স. জানিয়েছেন, আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার বান্দাদের একমুখী ঐকান্তিক আদর্শের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তানেরা তাদের প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করেছে। তাদের উপর সেসব জিনিসকে হারাম করে দিয়েছে, যা আমি হালাল করেছিলাম। তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক বানাবার যাদের আমার সাথে শরীক হওয়ার কোন সনদ আমি কখনোই অবতীর্ণ করিনি।'[১২]

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, হালালকে হারাম বলা শিরক পর্যায়ের কাজ। আরব মুশরিকরা যে শিরক করত, মূর্তিপূজা করত, ক্ষেত-ফসল ও জীব জন্তুর ন্যায় পবিত্র জিনিসগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম বানিয়ে নিয়েছিল, কুরআন মজীদ সেজন্য তাদের প্রতি তীব্র রোষ প্রকাশ করেছে। বাহীরা, সায়েবা, অসীলা ও হাম-এ সবই ছিলো তাদের হারাম করা জন্তুগুলোর নাম। পিতৃ পুরুষের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে এ ধরনের কাজ করা যে কোনক্রমেই উচিত নয় তা কুরআন মজীদ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ বাহীরা, সায়েবা, অসীলা ও হাম কোন কিছুই নির্ধারণ করেননি। এ কাফেররা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। ওদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না। ওদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান গ্রহণ কর এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তখন ওরা বলে, আমাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, সত্য পথ প্রাপ্তও ছিল না তারা, তাহলেও কি ওরা তাদের পথ অনুসরণ করতে থাকবে?'[১৩]

আল্লাহ আরো বলেছেন, 'তোমাদের মুখে মিথ্যা উচ্চারিত হয় বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে তারা সফলকাম হয় না।'[১৪]

এসব সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে জানতে পারা যায় যে, হালাল-হারাম নির্ধারণ ও ঘোষণার একমাত্র অধিকার মহান আল্লাহর। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ অধিকার অন্য কারো নেই, থাকতে পারে না। কুরআন মজীদে বলেই দেয়া হয়েছে, 'আল্লাহ যা কিছু তোমাদের জন্য হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদের উদ্দেশে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।'[১৫]

ইমাম শাফেয়ী র. তার বিখ্যাত আল-উম্ম গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা র. এর ছাত্র কাযী আবু ইউসুফের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি বিপুল সংখ্যক সুবিজ্ঞ ও দীন পারদর্শীদের দেখেছি। তারা ফাতাওয়া দেয়া পছন্দ করতেন না। কোন জিনিসকে তারা সরাসরি হালাল বা হারাম বলার পরিবর্তে কুরআনে যা আছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই তা বলে দেয়াকে যথেষ্ট মনে করতেন।'[১৬] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, 'যে জিনিসটি হারাম

হওয়ার কথা নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে জানা গেছে, কেবলমাত্র সে জিনিসটি ছাড়া অন্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে প্রাথমিককালের মনীষীগণ কখনও হারাম শব্দটি প্রয়োগ করতেন না।'[১৭]

পানাহারে হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির অবস্থান

ইসলাম-পূর্ব যুগের লোকেরা নানা দিক দিয়েই মারাত্মক গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। পানাহারে হালাল-হারামের ব্যাপারটি ছিল তন্মধ্যে অন্যতম। তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করে নিয়েছিল। এ ব্যাপারে সাধারণ মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহুদী ও খৃস্টান সকলেরই দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণ অভিন্ন। এ গোমরাহী উপনীত হয়েছিল চরম প্রান্তিকে। অপরদিকে ভারতীয় হিন্দু ধর্মের কিছু সম্প্রদায় ও খৃস্টিয় বৈরাগ্যবাদ পৌঁছে গিয়েছিল আরেক চরমে। তাদের মতে দেহকে কষ্ট ও পীড়ন দান বৈধ ছিল, উত্তম খাদ্য দ্রব্য ও চাকচিক্যমণ্ডিত জিনিসপত্র ব্যবহার করাকে তারা হারাম ঘোষণা করেছিল। পারস্যের মুজদাক ধর্মমত ছিল অপর এক প্রান্তিক সীমায় অবস্থিত। এ মতে সব কিছুই ছিল মুবাহ বা বৈধ বলে বিবেচিত। কোন কিছুই তাদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল না।[১৮]

আর জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা হালাল-হারামের একটা সম্পূর্ণ ভুল মানদণ্ড ঠিক করে নিয়েছিল। তাদের মতে নানা প্রকার অবৈধ সম্পদ ভক্ষণ, মদ্যপান ও বেশি বেশি সুদ খাওয়া বিন্দুমাত্র দোষ বা আপত্তির কারণ ছিল না। অপরদিকে তারা বহু প্রকার পবিত্র ও হালাল ফসল এবং জীব খাওয়াকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। আর বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল এই যে, এ নিষেধের কথাকে তারা দীনের বিধান বলে প্রচার করে বেড়াত। তাদের দাবি ছিল স্বয়ং আল্লাহই এসব জিনিস হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের এ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা দাবির প্রতিবাদ করে ইরশাদ করেছেন, 'আর তারা বলত এসব চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেতের ফসল হারাম। তা খেতে পারবে না কেউ, তবে আমরা যাদের চাইব তারা খাবে। এটা তাদের মনগড়া ধারণা। আরও কতিপয় জন্তু রয়েছে যাদের পৃষ্ঠকে হারাম করা হয়েছে, এছাড়া এমন জন্তুও রয়েছে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করতে গিয়ে যেগুলো জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। তাদের এ মিথ্যা আরোপের প্রতিফল আল্লাহ অবশ্যই দেবেন।'[১৯]

পানাহারে হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি

হালাল-হারাম নির্ধারণের এমনই বিকৃতি ও গোমরাহীর পরিবেশে ইসলাম সুন্দর ও সুষম নীতিমালাসহ শান্তি ও কল্যাণের শুভ বার্তা নিয়ে বিশ্বমানবতার সামনে হাজির হয়েছিল। হালাল-হারাম নির্ধারণের জন্য ইসলাম একটি শাশ্বত মানদণ্ড স্থির করেছে। এর উপর ভিত্তি করেই প্রতিটি ব্যাপারকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে যাচাই করা হয়েছে। এজন্যে সুবিচারের মাপকাঠি সর্বসমক্ষে দাঁড় করাতে হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে অতীব ভারসাম্যপূর্ণভাবে হালাল-হারাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলেই মুসলিম উম্মাহকে 'উম্মাতান ওয়াসা' তথা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী জাতি এবং 'খাইরু

উম্মাহ' বা উত্তম জাতি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এ পর্যায়ে ইসলাম হালাল-হারাম নির্ধারণকে আল্লাহর কাজ বলে স্থির করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা মেনে চলার জন্য মানবজাতিকে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করে। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু দলীল পেশ করা হয়েছে।

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা হূদ : ৬।
২. সূরা আল-আনকাবূত : ৬০।
৩. সূরা আল-আনকাবূত : ৬০।
৪. সূরা আল-বাকারাহ : ১৬৮।
৫. ড. সা'দ আল-ইয়ূবী, মাকাসিদুশ শারীয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮, রিয়াদ, পৃ: ২১১, ২৮৩।
৬. ড. কিলআ'জি, ফিকহ, পরিভাষা অভিধান, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫, রিয়াদ, পৃ: ১৮৪ ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, মাওলানা আবদুর রহীম অনূদিত, ১০ম প্রকাশ ২০০২, পৃ: ২৫।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৭।
৮. সূরা আশ-শূরা : ২১।
৯. সূরা আত-তাওবাহ : ৩১।
১০. সুনান তিরমিযিতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।
১১. সূরা ইউনুস : ৫৯।
১২. সহীহ মুসলিম।
১৩. সূরা আল-মায়িদাহ : ১০৩-১০৪।
১৪. সূরা আন-নাহল : ১১৬।
১৫. সূরা আল-আনআ'ম : ১১৯।
১৬. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ: ৩৯।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. সূরা আল-আনআ'ম : ১৩৮।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ৩০-৪২

ইসলামে সর্বজনীন মানবাধিকার : প্রেক্ষিত অমুসলিম অধিকার

ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান

সর্বজনীন মানবাধিকার রক্ষায় মহা নবী ঘোষণা করেন : 'সবাই জেনে রাখ! অমুসলিম নাগরিকদের উপর যে ব্যক্তি জুলুম করবে অথবা তার অধিকার হ্রাস করবে, অথবা তার সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব তার উপর চাপাবে অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার থেকে কিছু হরণ করবে আমি উক্ত যালিমের বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন উক্ত অমুসলিম নাগরিকের পক্ষে অভিযোগ দায়ের করবো।'[১]

পাশ্চাত্যের ওরিয়েন্টালিস্টরা এখন মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সাংঘাতিক প্রবক্তা সেজেছেন। আর মুসলমানদেরকে মানবতা বিরোধী ও মধ্যযুগীয় এবং চরমপন্থী সন্ত্রাসী (!) বলছেন। অথচ এই সেদিন মাত্র ১৯৪৮ সালে ওঁরা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মানবাধিকার আইন পাশ করান। অন্যদিকে ৬১০ সালে ইসলাম ঘোষণা করেছে, 'বংশ, বর্ণ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান।' শুধু ঘোষণা নয়, ইসলামের শাসনামল ছিল এই ঘোষণা বাস্তবায়নের স্বর্ণ যুগ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সম্পর্কে বিশ শতকের মাঝামাঝি আইন পাশ করে। অথচ ৬২৪ খৃস্টাব্দে ইসলাম বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বিধি নির্ধারণ করে যে, 'মুসলিম নাগরিকরা না খেয়েও যুদ্ধবন্দী অমুসলিমদের খাওয়াবে।' মাত্র ১৮৬৩ সালে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা বন্ধ হয়। এই বন্ধ করার আইন পাশ করতে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে সোয়া ৬ লাখ মানুষ নিহত হয়, অথচ সাড়ে ১৩শ বছর পূর্বেই ইসলাম দাসপ্রথা বিলুপ্তির সূচনা করেছে। ওঁদের আন্তর্জাতিক আইন রচনার ইতিহাস শুরু হয় গ্রীসের নগর রাষ্ট্র দিয়ে। অতপর রোমান সভ্যতার বর্ণনা দিয়ে তারা এক লাফ দিয়ে চলে আসে আধুনিক যুগে। মাঝখানে ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণ যুগের অবদানের কথা তারা ভুলে যায় অথবা সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করে রাখে। পাশ্চাত্যের এই অন্ধত্ব তাড়িত প্রপাগাণ্ডার কারণেই এবং মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলন না থাকার ফলেই ইসলামে মানবাধিকার বিশেষ করে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার তথা ইসলামে সর্বজনীন মানবাধিকার সম্পর্কে বারবার আমাদেরকে নতুন করে আলোচনা করতে হচ্ছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অহমিকা থেকে। আজও বুশ ব্লেয়ারের সন্ত্রাসী আগ্রাসন সন্ত্রাস দমনের জন্য নয় বরং মার্কিনী নেতৃত্বে বিশ্বের প্রভুর আসনে বসে ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থান ঠেকানোর জন্য। এই অহমিকার জন্ম পাশ্চাত্য সমাজে তাদের ইতিহাসের শুরু থেকে। গ্রীক সভ্যতার ঘোষণা হলো, 'যারা গ্রীক নয় তারা গ্রীকদের ক্রীতদাস হবে এটাই প্রকৃতির

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

ইচ্ছা।' রোমান সভ্যতার বিশ্বাস হলো, 'তারাই পৃথিবীর মালিক, পৃথিবীর সব সম্পদ তাদের জন্যই।' তারা নিজেদের পরিচয় দিত সব মানুষের প্রভু বলে। আজকের পাশ্চাত্যের পরম বন্ধু ইহুদীদের ঘোষণা হলোঃ 'যখন তোমার পূজনীয় প্রভু কোন নগরকে তোমার অধীন করবেন, তখন নগরের প্রতিটি পুরুষকে তলোয়ারের তীক্ষ্ণতায় হনন করবে। তোমার শত্রুর সবকিছু তুমি ভোগ করবে।'[২]

অন্যদিকে ইসলাম অন্য জাতির ন্যায্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সহাবস্থানকে স্বাভাবিক হিসেবে ঘোষণা করেছে। শত্রু হলেও মানুষ হিসেবে তাদের মৌলিক ও ন্যায্য অধিকারের সংরক্ষণ করেছে ইসলাম। হযরত আবুবকর রা. তাঁর সেনাবাহিনীকে শত্রু দেশে জিহাদের জন্য পাঠাবার সময় তাদেরকে নির্দেশ দিতেন, '(অমুসলিমদের) অর্থ অপহরণ করো না, তসরূপ করো না, প্রতারণা করো না, শিশুকে কিংবা বয়োবৃদ্ধকে কিংবা স্ত্রীলোককে হত্যা করো না। খেজুর গাছ কাটবে না, বা দগ্ধ করবে না। কোন ফলের গাছ কাটবে না। গীর্জা ধ্বংস করো না, ফসল দগ্ধ করো না।' আর হযরত উমর রা. এর নির্দেশ হলোঃ 'যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করো না। তোমার শক্তি থাকলেও কারো অঙ্গচ্ছেদ করো না। বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করো না। বৃদ্ধ ও নাবালককে হত্যা করো না, বরং দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের সময় তাদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।'[৩]

ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার প্রদানের ইতিহাস এবং পাশ্চাত্যের পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত বিশ্ব মানবতা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে। ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন জেরুসালেম দখল করে, তখন কোন একজন খৃস্টান বা ইহুদীর গায়ে হাত দেয়া হয়নি। কিন্তু পাশ্চাত্যের খৃস্টান বাহিনী যখন জেরুসালেম দখল করে তখন নগরীর ৭০ হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুকে তারা হত্যা করে। বিনা প্রমাণে ও বিনা বিচারে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তান ও ইরাকে যে গণহত্যা চালাচ্ছে তা তাদের ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা। আর ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা হলো সহনশীলতা ও সহাবস্থানের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস।

খিলাফতে রাশেদার যুগে কোন নতুন ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে আসলে সেখানকার অমুসলিমদেরকে আর শত্রুর দৃষ্টিতে দেখা হতো না। মুক্ত মানুষ হিসেবে তাদের এ অধিকার দেয়া হতো যে, তারা এক বছর সময়কালের মধ্যে যেন সিদ্ধান্ত নেয়, তারা তাদের পছন্দমত অন্য কোন দেশে চলে যাবে, নাকি মুসলিম দেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করবে। অমুসলিম নাগরিক হিসেবে থাকলে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যোগ্যতার ভিত্তিতে খিলাফতে রাশেদার অধীনে রাষ্ট্রের বড়বড় পদে তাদের নিয়োজিত করা হতো। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণ যুদ্ধে না যাওয়ার বিনিময়ে 'যিযিয়া' নামক নিরাপত্তা ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, মুসলিম নাগরিকগণ যুদ্ধে গিয়ে জীবন ও সম্পদের যে ঝুঁকি নেয় সেই তুলনায় অমুসলিম নাগরিকদের এই নিরাপত্তা 'কর' খুবই সামান্য ত্যাগ। ইসলাম বিজিত দেশের অমুসলিমদের সম্পদে হাত দেয়ার কোন অনুমতি দেয় না, তাদের উপর যে 'যিযিয়া' ধার্য করা হয়, সেটাও তাদের সাধ্য অনুসারে করা হয়, এবং নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের উপর কোন 'যিযিয়া' আরোপ করা হয় না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যখন

অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ইসলামী সরকার অসামর্থ হত, তখন যিযিয়া হিসেবে আদায়কৃত অর্থ তাদেরকে ফেরত দেয়া হত।

হযরত উমর রা.-এর যুগে মুসলমানরা হেমস দখল করেছিল। পরবর্তীকালে সামরিক প্রয়োজনে যখন হেমস থেকে মুসলমানদের সরে আসতে হলো, তখন মুসলিম সেনাপতি অমুসলিমদেরকে তাদের যিযিয়া করের টাকা ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা তোমাদের হেফাজত করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। যেহেতু আমরা তা পারছি না, তাই তোমাদের অর্থের উপর আমাদের কোন অধিকার নেই।' অধীনস্থ বা বিজিত দেশের নাগরিকদের অধিকারের প্রতি মর্যাদা দেয়ার এবং নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা ফেরত দেয়ার এমন দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যের গোটা ইতিহাস খুঁজলে একটিও পাওয়া যাবে না। বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার তো এটাই ঐতিহ্য যে, তাদের সৈন্যবাহিনী যখন কোন দেশ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়, তখন তারা পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে এবং লুণ্ঠন ও ধ্বংসের মাধ্যমে সে ভূখণ্ডের মানুষকে সর্বশান্ত করে। রাশিয়ার পোড়ামাটি নীতির কাছেই জার্মান বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। আফগানিস্তানে রুশ বাহিনী যে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে, আজকের পাশ্চাত্য বাহিনী আফগানিস্তান ও ইরাকে সে একই পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করছে, গোটা বিশ্ববাসী আজ তার নির্মম সাক্ষী। অথচ হযরত উমর রা. এর সময় একটি বিজিত দেশে হযরত উমর রা. একটি মসজিদ ভেঙে ফেলেছিলেন, কারণ মসজিদের জমিটা একজন অমুসলিমের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল। মসজিদটি ভেঙে ফেলার পর উক্ত জমিটুকু তার মালিককে ফেরত দেয়া হয়েছিল।[৪]

মদীনা সনদে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কিত নির্দেশনা

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দলিল 'The Constitution of Madina, Convent Charter' যা 'মীসাকুল মদীনা' বা মদীনা সনদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নিম্নে তার সারকথা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলো:

১. ইহুদীদের মধ্য হতে যারা আমাদের অনুসরণ করবে তাদের সাহায্য করা হবে এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা হবে। তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না এবং তাদের শত্রুদের সাহায্য করা হবে না।

২. বনু 'আউফের ইহুদীরা মুমিনদের সঙ্গে একই উম্মাহ। ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুমিনদের জন্য তাদের ধর্ম। তাদের আশ্রিত এবং তারা নিজেরাও। হ্যাঁ, তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করে সে নিজের এবং তার পরিবারের ক্ষতি সাধন করবে।

৩. অন্যান্য সকল গোত্রের ইহুদীরাও বনু আউফের ইহুদীদের মত একই দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকারপ্রাপ্ত হবে।[৫]

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকারের মূল কথা হলো

এ পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা শক্তি ও চেষ্টার স্বাধীন ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করার চেষ্টা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ স. ও চার

খলিফার শাসনকালে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারে ইনসাফপূর্ণ যে সকল নীতি চালু ছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

১. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধা দেয়ার কারো ইখতিয়ার নেই।

২. নাগরিক অধিকার বা সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই।

৩. আদালতে বিচারের বেলায়ও একই আইন সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

৪. ব্যক্তিগত আইনে বিবাহ, তালাক, সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে কোন ধর্মের লোক যদি তাদের নিজ ধর্মের নিয়ম-নীতি পালন করতে চায় তবে তাদের সে সুযোগ দেয়া হবে।[৬]

ইসলামে অমুসলিম নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ

১. আকীদা ও ইবাদতের স্বাধীনতার অধিকার : ইসলাম কোন লোককে ইসলামী আকিদা গ্রহণের জন্য বলপূর্বক বাধ্য করে না। ইসলাম গ্রহণে বা অমুসলিমদের ধর্ম পরিবর্তনে করার ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই, একথা কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে এভাবে: (লা-ইকরাহা ফীদদীন) 'দীন গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি করা চলবে না।'[৭]

নবী করীম স. নাজরানবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে লিখেছিলেন: 'নাজারাবাসীরা এবং তাদের সঙ্গি-সাথীরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ স.-এর নিরাপত্তা লাভ করবে, তাদের ধন-মালে তাদের গীর্জা ও উপাসনাগারে এবং আর যা কিছু তাদের রয়েছে সে ব্যাপারে।'[৮]

২. অমুসলিম নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের জন্যও পূর্ণ মাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত থাকে। এ পর্যায়ে ইসলামী নীতি হলো : 'আমাদের জন্য যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, অমুসলিমদের জন্যও তাই এবং আমাদের ওপর যেসব দায়িত্ব তাদের ওপরও তাই।' হযরত আলী রা. তাই বলেছেন : 'অমুসলিম নাগরিকরা 'যিযিয়া' আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ মুসলিম নাগরিকের মতই সংরক্ষিত হবে।'[৯]

নবী করীম স. ঘোষণা করেছেন, 'যে লোক ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে কোনরূপ কষ্ট দেবে, আমি নিজেই তার বিপক্ষে দাঁড়াবো, কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করবো।'[১০]

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সপক্ষে নবী করীম স. যেসব অসীয়ত করেছেন তার ভিত্তিতে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ওয়াজিব এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।' ফকীহ কারাফী বলেছেন, 'অমুসলিম নাগরিককে যদি কেউ কষ্ট দেয়, একটি খারাপ কথাও বলে, তাদের অসাক্ষাতে তাদের ইজ্জতের ওপর একবিন্দু আক্রমণও কেউ করে কিংবা তাদের সাথে শত্রুতায় ইন্ধন যোগায় তাহলে সে আল্লাহ এবং তার রসূলের এবং দীন ইসলামের দায়িত্ব লংঘন করলো।'[১১]

আল্লামা ইবনে হাজাম বলেছেন: এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদদের ইজমা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করার জন্য কোন শত্রু যদি হামলা করতে চায় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো তার হেফাজতের জন্য প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা।'[১২]

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার যে মহান দায়িত্ব পালন করে, তা কেবল মুসলিম নাগরিকদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বস্তুত এ ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিম কোনই পার্থক্য করা হয় না। খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা.-এর শাসন আমলে সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের স্বাক্ষরিত চুক্তিনামায় বলা হয়েছে: 'অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে যে লোক বার্ধক্য, পংগুতা বা বিপদের কারণে অথবা দরিদ্র হয়ে পড়ার কারণে যদি মানুষের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয় তাহলে তার নিকট থেকে যিযিয়া নেয়া বন্ধ করতে হবে এবং সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন পর্যন্ত তার পরিবারবর্গকে রাষ্ট্রের বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণ করা হবে।[১৩]

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. তাঁর বসরার শসনকর্তা আদী ইবনে আরতাতকে লিখে পাঠিয়েছিলেন: 'তুমি নিজে খোঁজ নিয়ে দেখ, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে যেসব লোক বয়োবৃদ্ধ ও কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে এবং যাদের উপার্জন-উপায় কিছুই নেই, তুমি তাদের প্রয়োজনমত অর্থ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে তাদেরকে দিয়ে দাও।'[১৪]

৪. অমুসলিম নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার : ইসলাম মানব জীবনকে একান্তই সম্মানের বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কোন মানুষের জীবন সংহারকে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য অপরাধ সাব্যস্ত করে জীবনের নিরাপত্তার গুরুত্বের প্রতি যতটা জোর দিয়েছে তার উদাহরণ পৃথিবীর কোন ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা আইন শাস্ত্রের কোথাও মিলে না। মহান আল্লাহর বাণী, 'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে রক্ষা করল।'[১৫]

কেবল মুসলমানদের জীবনই সম্মানিত নয়; আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেক বান্দার জীবনই সম্মানিত। কোন মুসলমানের হাতে অন্যায়ভাবে কোন 'যিম্মি' অমুসলিম নিহত হলে সেই মুসলমানের জন্য জান্নাত হারাম। নবী করীম স. বলেন: 'যে ব্যক্তি কোন 'যিম্মিকে' হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।'[১৬] অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমকে হত্যা করল, সে কখনো জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।'[১৭] মহান আল্লাহ 'হত্যা'কে এমন জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন যে, এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহকালে 'কিসাসের' শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও আখেরাতে জাহান্নামী হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের বিশেষ অধিকার

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারসমূহ সম্পর্কে একথাটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, ইসলামী রাষ্ট্র যেভাবে মুসলিম নাগরিকদের বেলায় কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধ্য তেমনিভাবে সে অমুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারেও কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত সীমারেখা অনুসরণ করতে বাধ্য। এগুলো সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই।

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকগণ শরীয়ত নির্ধারিত অধিকারসমূহ হ্রাস করতে পারেন না, তবে তাঁরা রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আরও কিছু অধিকার দিতে পারেন, তবে শর্ত হচ্ছে তা যেন ইসলামী নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এর অর্থ এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকার নির্ধারণ এবং তা সংরক্ষণের দিক থেকে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা সমান। উভয়ের অধিকারের গ্যারান্টি দিয়েছে ইসলাম। মুসলিম নাগরিকদের অধিকারের প্রশ্নে যে আইনগত বিচার বিভাগীয় নিরাপত্তা বিদ্যমান অমুসলিম নাগরিকগণও সেই একই নিরাপত্তার অধিকারী, বরং অমুসলিমদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। ইসলামী রাষ্ট্র সময়ের দাবি ও প্রয়োজনের তাগিদে মুসলিম নাগরিকদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করতে পারে, তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকদের উপর চুক্তির শর্তাবলীর অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপাতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র যদি মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে অপারগ হয় এবং বৈদেশিক হামলার সময় তার কার্যকর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে সে মুসলমানদের থেকে আদায়কৃত 'কর' ফেরতদানে বাধ্য থাকবে না। কিন্তু এরূপ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রকে অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে যিযিয়া বাবদ আদায়কৃত অর্থ অবশ্যই ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। যেমন ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় হযরত আবু উবায়দা রা. হেমস ও দামিশকসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার অমুসলিম নাগরিকদেরকে তাদের দেয়া যিযিয়ার অর্থ তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে অপরাগতার ক্ষেত্রে ফেরত দিয়েছিলেন।

ইসলামী শরীয়া আইন অমুসলিম নাগরিকদেরকে তাদের মর্যাদা অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে :

১. চুক্তিবদ্ধ যিম্মি : যে সকল লোক কোন যুদ্ধ ব্যতিরেকে অথবা যুদ্ধ চলাকালে যিম্মি (আশ্রিত) হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে সম্মত হয় এবং সন্ধিবদ্ধ অথবা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এসে যায়।

২. পরাজিত গোষ্ঠী : যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল ও মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছে এবং যাদের ওপর এখন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এদেরকে 'আহলুল আনাওয়া' বলা হয়।

৩. যেসব লোক যুদ্ধ কিংবা সন্ধি ব্যতীত অন্য কোনভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছে।

উক্ত তিন শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কে কিছু আলোচনা সংক্ষেপে পেশ করা হলো :

১. চুক্তিবদ্ধ যিম্মিদের সম্পর্কে শরীয়তের মৌলিক বিধান এই যে, তাদের সাথে চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী আচরণ করতে হবে এবং যেসব শর্ত স্থির হয়েছে তা কঠোরভাবে পালন করতে হবে। সরকার পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। তাদের মর্যাদা স্থায়ী হবে, তবে হ্যাঁ, যদি চুক্তিবদ্ধ যিম্মিগণ কোনপ্রকার সংশোধন বা সংযোজন করতে চায় এবং তা পারস্পরিক সম্মতিতে মীমাংসিত হয়, তবে ভিন্ন কথা। এই চুক্তিতে ইচ্ছামত পরিবর্তন করার

এখতিয়ার কোন অবস্থাতেই ইসলামী রাষ্ট্রের নেই এবং একে একতরফাভাবে রহিত করা কিংবা জোর পূর্বক যিম্মিদেরকে কিছু নতুন শর্তাবলী গ্রহণে বাধ্য করারও কোন এখতিয়ার নেই।

মহানবী স. ইরশাদ করেন : 'সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ মানুষের উপর জুলুম করবে কিংবা তার অধিকার খর্ব করবে অথবা তার সাধ্যের বাইরে তার উপর বোঝা চাপাবে কিংবা তার অসম্মতিতে তার থেকে কোন জিনিস আদায় করবে, তার বিরুদ্ধে আমি নিজেই কিয়ামতের দিন দাবি উত্থাপন করব।'[১৮] অন্য এক হাদীসে মহানবী স. বলেন : 'তোমরা যদি কোন জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে তার উপর বিজয়ী হও আর সে জাতি তাদের নিজেদের ও ভবিষ্যত বংশধরদের প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাদেরকে (খারাজ) 'কর' দিতে সম্মত হয়, তাহলে পরবর্তীতে নির্ধারিত (খারাজের) 'করের' চাইতে একটি শস্যকণাও বেশি গ্রহণ করবে না। কেননা তোমাদের জন্য তা জায়েয হবে না।'[১৯]

ইমাম আবু ইউসুফ র. এ প্রসঙ্গে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন : 'তাদের নিকট থেকে সেই পরিমাণই গ্রহণ করা যাবে সন্ধি করার সময় যেই পরিমাণের চুক্তি করা হয়েছিল এবং এর অতিরিক্ত কিছুই ধার্য করা যাবে না।'[২০]

২. যুদ্ধে পরাজিত অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবে :

ক. ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন উল্লেখিত যিম্মিরা যিযিয়া প্রদানে সম্মত হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী সরকারের উপর সব সময়ের জন্য চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্বভার অর্পিত হবে এবং যিম্মিদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্র পরিচালকদের উপর ফরয হয়ে যাবে। তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাবে না ও তাদেরকে দাসও বানানো যাবে না।

খ. যিম্মিরা তাদের সম্পত্তি মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। তাদের সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে হস্তান্তর করতে পারবে। তারা নিজেদের মালামাল-কেনাবেচা, দান, বন্ধক ইত্যাদি সম্পাদনের সমস্ত অধিকার ভোগ করবে। ইসলামী রাষ্ট্র তাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারবে না।

গ. যিম্মিদের সামর্থের উপর ভিত্তি করে যিযিয়া ধার্য করতে হবে। অর্থাৎ বিত্তবানদের উপর বেশি, মধ্যবিত্তদের উপর তার চেয়ে কম এবং নিম্নবিত্তদের উপর আরো কম। যারা উপার্জনে অক্ষম এবং অন্যদের আশ্রয়ে জীবন-যাপন করে তাদের যিযিয়া মওকুফ থাকবে।

ঘ. কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষম লোকদের (Combatants) উপর যিযিয়া ধার্য করা হবে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম, ধর্মযাজক, উপাসনালয়ের কর্মচারী, স্থায়ী রুগ্ন ব্যক্তির নিকট থেকে যিযিয়া নেয়া যাবে না।

ঙ. যিম্মিদের উপাসনালয়গুলো পূর্বাবস্থায় বহাল রাখতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ র. লিখেছেন, 'খিলাফতে রাশেদার সময় যিম্মিদের উপাসনালয়সমূহ স্বঅবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, সেগুলো না ধ্বংস করা হয়েছে এবং না এগুলোর উপর কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।'[২১]

রসূলুল্লাহ স. ও খোলাফা ই রাশেদার যুগে মুসলমানরা সরাসরি যিম্মিদের সাথে সম্পাদিত সমস্ত

চুক্তিতে তাদের উপাসনালয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণের গ্যারান্টি দান করেন। পরবর্তী শাসকবর্গও এই নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করেন।

চুক্তিবদ্ধ যিম্মি ও বিজিত যিম্মিদের এই বিশেষ অধিকার ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী তিন শ্রেণীর যিম্মিই নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবে

ক. ইসলামী ফৌজদারী আইন তো এমনিতেই মুসলিম ও যিম্মিদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু মদ্যপানের ব্যাপারে যিম্মিরা এর ব্যতিক্রম। ইমাম মালিক র.-এর মযহাব অনুসারে তারা ব্যভিচারের বেলায়ও ব্যতিক্রম। তিনি হযরত উমর রা. ও হযরত আলী রা. এর নিম্নোক্ত মীমাংসা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে, তাদের মতে যিম্মি ব্যভিচার করলে তাকে তাদের সমাজের বিচার ব্যবস্থার হাতে অর্পণ করতে হবে।

খ. দেওয়ানী আইনও মুসলমান এবং যিম্মিদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সম্পদের উপর অধিকার ও বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের যেসব পন্থা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ সেগুলো তাদের ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ। সুদী কারবার যেমনিভাবে মুসলমানদের জন্য হারাম, তেমনিভাবে তা যিম্মিদের জন্যও হারাম। অবশ্য মদ্যপান ও শূকর এর ব্যতিক্রম। যিম্মিরা মদ তৈরি করতে পান করতে এবং নিজেদের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে। তারা শূকর পালন করতে, ভক্ষণ করতে এবং নিজেদের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে। যদি কোন মুসলমান কোন যিম্মির মদ কিংবা শূকর নষ্ট করে তাহলে তাকে অবশ্যই জরিমানা দিতে হবে।

গ. (আকদুল যিম্মাহ) চুক্তির বন্ধন রক্ষা করা মুসলমানদের স্থায়ী কর্তব্য। অর্থাৎ সে একবার চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তা কখনো ভঙ্গ করতে পারবে না। কিন্তু যিম্মিরা ইচ্ছা করলে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে। অমুসলিম নাগরিক যত বড় অপরাধই করুক না কেন মুসলমানদের চুক্তি রক্ষার বাধ্যবাধকতা বাতিল হবে না। এমনকি যিম্মিরা যিযিয়া দিতে অস্বীকার করলে, মুসলমানকে হত্যা করলে, নবী করীম স. সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক কথা বললে, মুসলমান নারীর মানহানি করলেও যিম্মা (দায়িত্ব) বলবৎ থাকবে। তারা উপরোক্ত অপরাধের আইনানুগ শাস্তি ভোগ করবে, কিন্তু যিম্মা (নিরাপত্তা গ্যারান্টি) থেকে বহিস্কৃত হবে না। শত্রুদের সাথে যোগসাজশ করলে এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে এই দুই অবস্থায়ই যিম্মি চুক্তি রহিত হয়ে যাবে।[২২]

ঘ. যিম্মিদের ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহ তাদের নিজস্ব 'ব্যক্তিগত আইন' (Personal Law) অনুসারে নিষ্পত্তি হবে, যেমন অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে যদি সাক্ষী ব্যতিরেকে বিবাহ, মোহর ব্যতিকেরকে বিবাহ, ইদ্দত চলাকালে দ্বিতীয় বিবাহ, কিংবা মাহরাম মহিলাদের বিবাহ করা জায়েয থাকে তবে তা তাদের ধর্মের নিয়মেই চালু থাকবে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর একটি ফতোয়া প্রার্থনার জবাবে হাসান বসরী র. তাঁকে নিম্নোক্ত ফতোয়া দিয়েছিলেন: '(যিম্মি) অমুসলিম নাগরিকগণ তো যিযিয়া প্রদানের বিষয়টি এজন্য কবুল করেছে যে, এর বিনিময়ে তাদের

ধর্ম-বিশ্বাস মতে তাদেরকে জীবন-যাপনের স্বাধীনতা দেয়া হবে। আপনার কাজ তো পূর্ববর্তী নিয়ম অনুসরণ করা, কোন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়।[২৩]

ঙ. যিম্মিরা (অমুসলিম নাগরিকগণ) তাদের নিজস্ব মহল্লা ও বসতিতে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও জাতীয় উৎসবাদি পালন করার ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। তবে মুসলমানদের মহল্লায় প্রকাশ্যভাবে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করার অনুমতি দেয়া যাবে না। অবশ্য তাদের উপাসনালয়ে সব সময়ই পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকবে। সরকার এতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মুসলমানদের শহরসমূহে (ঐসব স্থানসমূহ যার ভূমি মুসলমানদের মালিকানাধীন এবং যেগুলোকে মুসলিমরা তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে) অমুসলিম নাগরিকদের প্রাচীন ইবাদত খানার ব্যাপারে মুসলিম নাগরিকগণ কোন বিরোধ করতে পারবে না। যদি সেগুলো ভেঙ্গে গিয়ে থাকে তাহলে অমুসলিম নাগরিকগণ তা নতুন করে নির্মাণের অধিকার পাবে। যেসব স্থান মুসলমানদের শহর নয় সেখানে তারা নতুন উপাসনাগৃহ নির্মাণের অনুমতি পাবে।

চ. অমুসলিম নাগরিকগণ নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করার এবং নিজেদের মধ্যে স্ব-স্ব ধর্মের প্রচার করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা তাদের ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। অবশ্য তাদেরকে ইসলামের উপর বিদ্রূপাত্মক আক্রমণের অনুমতি দেয়া যাবে না।[২৪]

অমুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, বর্তমান যুগের ইসলামী রাষ্ট্রে তাদেরকে নেতৃত্বের 'পদ' দেয়ার পদ্ধতি কী হবে? স্থানীয় পরিষদের (Local Bodies) প্রতিনিধিত্ব করার পূর্ণ অধিকার তাদের মধ্যকার যোগ্য ব্যক্তিদের দেয়া যেতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরামর্শ সভায় অর্থাৎ সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি একটু জটিল। এ পর্যায়ে দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

এক. পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে অমুসলিম নাগরিকদেরকে জনসংখ্যার হার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব দেয়া যেতে পারে। কিন্তু পার্লামেন্টে তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আইনের অধীন থাকতে বাধ্য থাকবে। অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে স্বয়ং কুরআন-সুন্নাহ তাদেরকে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে আইন প্রণয়নে তারা নিশ্চিতই স্বাধীন মতামত পেশ করতে পারবে।

দুই. অমুসলিমদের জন্য একটা পৃথক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করা যেতে পারে, যেখানে তারা তাদের নিজস্ব বিষয়সমূহ নিজেদের অভিমত অনুসারে সমাধান করতে পারবে এবং সরকার তাদের সুপারিশমালা যথার্থভাবে কার্যকর করতে সহায়তা করবে। তারা তাদের নিজস্ব ব্যাপারে আইন তৈরি করতে পারবে অথবা প্রচলিত আইন-কানুনে সংশোধন ও পরিমার্জনের অধিকারী হবে এবং তাদের প্রস্তাবসমূহ সরাসরি সরকারের অনুমোদনক্রমে আইনে পরিণত হবে, তারা সংসদীয় কার্যকলাপ এবং আইন সভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিজেদের প্রস্তাব, অভিযোগ, আপত্তি ও সুপারিশমালা স্বাধীনভাবে পেশ করতে পারবে। সরকার ন্যায় ও ইনসাফের দাবি অনুসারে তাদের

বিষয়টি বিশেষ সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে এবং অভিযোগসমূহ দূর করে মানসিক প্রশান্তির সাথে তাদের বসবাসের সুযোগ করে দিবেন।

এ সম্বন্ধে আধুনিক যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের নিকট ধরা-বাঁধা কোন নীতিমালা নেই। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে কোন যুক্তিসঙ্গত কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ইসলামের জীবনদর্শন যেহেতু সকল মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য, সেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের সকল নাগরিক অধিকারসমূহও কল্যাণকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম তাদেরকে আপন করুণার শীতল পরশে নিয়ে নেয় এবং যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও প্রাচুর্যে অংশীদার বানায়, কিন্তু ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার অনুমতি দেয় না। এজন্যই তাদেরকে শরীয়তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও নীতিনির্ধারণী কর্তৃত্ব থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[২৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কতিপয় উদাহরণ

পবিত্র ইসলামে অমুসলিম নাগরিকদেরকে 'যিম্মি' হিসেবে যেসব অধিকার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র তার প্রতি সম্মান প্রদানে ও তার বাস্তবায়নে বাধ্য। 'যিম্মি' শব্দটি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখতে হবে, এই পরিভাষা দ্বারা সেইসব লোকদের বুঝানো হয়েছে, যাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু এবং অন্যান্য সকল অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব মুসলমানরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র এমনিতেই প্রত্যেক নাগরিকের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বশীল, কিন্তু অমুসলিম নাগরিকদের জন্য 'যিম্মি' পরিভাষা ব্যবহার করেছে– যার মধ্যে স্বয়ং যিম্মাদারীর উপাদান বিদ্যমান রয়েছে– তাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে ধরা হলো, যাতে ইসলামের অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের কিছু চিত্র ফুটে উঠবে।

১. হযরত আবুবকর রা.-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের দুর্নাম গেয়ে ব্যঙ্গ কবিতা পাঠকারী এক মহিলার দাঁত উপড়ে ফেলা হয়। তিনি এ কথা জানতে পেরে গভর্নর মুহাজির ইবনে উমায়্যাকে লিখেছিলেন: 'আমি জানতে পেরেছি যে, মুসলমানদের দুর্নাম করে যে নারী ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করে বেড়াত তার সামনের পাটির দাঁত তোমরা উপড়ে ফেলেছ। এ নারী যদি মুসলমান হয়ে থাকে তবে তার জন্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কারই যথেষ্ট ছিল, তাকে নির্যাতনের চেয়ে হালকা শাস্তি দেয়া উচিত ছিল। আর যদি সে 'যিম্মি' হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে তার শিরক-এর মত মহাপাপ যখন বরদাশত করা হচ্ছে– সেখানে মুসলমানদের দুর্নাম আর তেমন কি! আমি যদি এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নে তোমাদের সতর্ক করে থাকতাম তবে তোমাদের ঐ শাস্তির প্রতিফল ভোগ করতে হত।'[২৬]

২. ফাতেমী শাসনামলে কতিপয় সরকারি উর্ধতন কর্মকর্তা সিনাই এলাকার খৃস্টান পাদ্রীদের ও ইহুদীদের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতে চাইলে এবং তাদের উপর কিছু 'কর' আরোপ করলে তারা রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে পূর্বেকার চুক্তিপত্রের কপিসমূহ পেশ করে এবং আব্দুল মজিদ আল-হাফেজের উযীর বহারাম এবং জাফরের উযীর আল-আব্বাস ও তালাই-এর নিকট থেকে নিজেদের অনুকূলে ডিক্রি লাভ করে। উক্ত চুক্তিপত্রে শাসকদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা পূর্বেকার

চুক্তিপত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং খিলাফতে রাশেদার যুগে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করবে। সাথে সাথে এই নির্দেশও জারি করা হলো যে, নুতনভাবে আরোপিত সকল প্রকারের 'কর' প্রত্যাহার করতে হবে এবং খৃস্টান ও ইহুদীদের সার্বিক নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে।[২৭]

৩. হযরত আলী রা. বাজারে এক খৃস্টানকে তাঁর বর্মখানি বিক্রি করতে দেখলে তিনি তাকে বললেন, এ বর্মটি আমার। খৃস্টান ব্যক্তি অস্বীকার করায় তিনি কাজী শুরাইহ রা.-এর নিকটে বিচারপ্রার্থী হন। বিচারক কাজী শুরাইহ সাক্ষী তলব করেন। কিন্তু হযরত আলী রা. তা পেশ করতে অপারগ হন। ফলে বিচারে খৃস্টান ব্যক্তির পক্ষেই রায় চলে যায়। হযরত আলী রা. স্বয়ং এই রায় গ্রহণ করে বলেন: 'শুরাইহ! তুমি সঠিক রায় দিয়েছ।' মামলার রায় শুনে খৃস্টান ব্যক্তি হতবাক হয়ে গেল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'এতো পয়গম্বর সুলভ ন্যায় বিচার, আমীরুল মুমিনীনকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় এবং তাঁকে তাঁর বিপক্ষে রায় শুনতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্মটি আমিরুল মুমিনীনেরই। এটা তার উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। আমি উঠিয়ে নিয়েছিলাম।[২৮] ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান হযরত আলী রা.-এর বিবাদী অমুসলিম বলে তার নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মত উল্লেখিত ইনসাফ কি দুনিয়ার অন্য কোথাও পাওয়া যাবে?

৪. একবার রাত্রিবেলা হযরত উমর রা. নাগরিকদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য বের হলেন। তিনি আচানক এক ব্যক্তির ঘরে গানের শব্দ শুনতে পান। তাঁর সন্দেহ হলে তিনি দেয়ালের উপর আরোহণ করে দেখলেন যে, ওখানে মদের পানপাত্র মজুদ আছে, তার সাথে আছে এক নারী। তিনি সজোরে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই কি মনে করছিস, তুই নাফরমানী করতে থাকবি; আর আল্লাহ তা ফাঁস করে দিবেন না? লোকটি উত্তর দিল, হে আমিরুল মুমিনীন! ব্যস্ত হবেন না, আমি যদি একটি অপরাধ করে থাকি তবে আপনি করেছেন তিনটি অপরাধ। আল্লাহ গোপন বিষয়াদি অন্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন, আর আপনি সে কাজটি করে ফেলেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে, আর আপনি প্রবেশ করেছেন দেয়াল টপকে। আল্লাহ আদেশ করেছেন, নিজের বাড়ি ব্যতীত অন্যের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করতে, আর আপনি অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেছেন।' একথা শুনে হযরত উমর রা. তাঁর ভুল স্বীকার করলেন এবং গৃহকর্তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। অবশ্য তার নিকট থেকে সৎ পথ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন।[২৯]

এ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের অগণিত উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি মাত্র। অমুসলিম নাগরিকগণ মহানবী স. ও খোলাফা ই রাশেদার যুগেই নয় বরং বনু উমায়্যা, বনু আব্বাস এবং তৎপরবর্তী মুসলিম শাসকগণের যুগেও নিজেদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা ভোগ করে আসছিল ইনসাফপূর্ণভাবে। একথার স্বীকৃতি দিয়ে প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারী ওয়াট লিখেছেন : 'অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে উত্তম আচরণ করেছে। তাদের সাথে সদাচারণ ছিল মুসলমানদের জন্য মহত্ব ও

মর্যাদার বিষয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অমুসলিমদের নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল ইসলামী সরকারের কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রত্যেক যুদ্ধ করতে সক্ষম অমুসলিম নাগরিক চুক্তি অনুযায়ী মাল অথবা নগদ অর্থের আকারে বাৎসরিক যিযিয়া বায়তুলমালে জমা করত। এছাড়া তাদেরকে মাথাপিছু করও পরিশোধ করতে হত, এর পরিবর্তে তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা লাভ করত এবং তারা মুসলমানদের মতই অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকেও নিরাপদ থাকার সুযোগ লাভ করত। যেসব প্রদেশে অমুসলিমদের বসবাস ছিল সেখানে তাদের থেকে যিযিয়া আদায় করা এবং মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যকার বিবাদ মিমাংসা করা ছিল শাসকের অন্যতম দায়িত্ব। প্রত্যেক সংখ্যালঘু নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নির্ধারিত যিযিয়া ও ট্যাক্স আদায় এবং তাদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় বিধান কার্যকর করাসহ সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিষয়ের দায়িত্বশীল ছিলেন।'[৩০]

মহানবী স. এবং ইসলামের চার খলিফার সময়কার রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তার পরবর্তী মুসলিম শাসকদের সময়ে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনায় ইসলামের সর্বজনীন কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থার পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজকের আত্মমুখী পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্ব জয়ের হাতিয়ার হিসেবে শেকড়হীন গণতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রণহীন মুক্ত অর্থনীতির দ্বারা বিশ্বকে গ্রাস করে চলছে। ইসলাম মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ নীতির পদ্ধতিগত স্থান-কাল-পাত্র ভিত্তিক যে সর্বজনীন অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে তা পৃথিবীর অন্য কোন মতবাদ বা শাসন ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। অতএব বর্তমান বিশ্বে সর্বজনীন শান্তি ও সকল মানুষের সত্যিকারের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হলে ভিত্তিতে মানবতার মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্যারান্টি ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। একে বিশ্ব শান্তির নিয়ামক আদর্শ নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারা, পৃ: ৪৩৩।

২. তওরাত, আদাদ, ৭:২-৫, এর বরাতে আবুল'আলা মওদুদী আলজিহাদ, (বাংলাবাজার, ঢাকা-১৯৯৩), পৃ: ৩৭৬।

৩. তারীখুল কবিরের বরাতে মাহমুদশাহ-এর তারিখুল ইসলাম, খ-৩, পৃ: ৬৬।

৪. ফতহুল বুলদান বালাজুরি পৃ. ২৭৭।

৫. ইবনুকাসির, আলবেদায়া ওয়ান্নেহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৪-২২৬।

৬. অধ্যাপক গোলাম আযম, ইসলামের সহজ পরিচয়, পৃ: ১০৮।

৭. আল-কুরআন, সূরা বাকারা ২৫৬।

৮. শারহুল কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭৪। বাদায়ে', খ. ৭, পৃ: ১১৩।

৯. আলমুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৫।

১০. আল জামেউস সাগীর লিসসূয়ুতী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৩।
১১. ড. আব্দুল করিম যায়দান, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, পৃঃ ৬৬-৬৭।
১২. আল-ফারুক লিল কারখী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪।
১৩. ইমাম আবু ইউসুফ র. কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৪৪।
১৪. আবু উবাইদ, কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৪৫-৪৬।
১৫. আল-কুরআন, সূরা মাইদাঃ ৩২।
১৬. সুনানে নাসাঈ, কিতাবুদ্দিয়াত (দেওবন্দঃ আশরাফী বুক ডিপো ১৯৮৫), খ. ২, পৃঃ ২০৯।
১৭. সহীহ আল-বুখারী কিতাবুদ্দিয়াত, খ. ২, পৃঃ ১০২১।
১৮. সুনানে-আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, খ. ৩, পৃঃ ৪৩৭।
১৯. প্রাগুক্ত।
২০. আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃঃ ৫৭৮।
২১. কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৪১৭।
২২. আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী রিয়াসাত, পৃঃ ৫৮৬।
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, ইসলামে মানবাধিকার, পৃঃ ২৯৭-৩০০।
২৫. প্রাগুক্ত।
২৬. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, সিয়াসা অসীয়াসীকাজাত, লাহোর ১৯৬০ খৃঃ, পৃঃ ২১৭।
২৭. (Stem SM. Fatimid Decrees, Faber and Feber, London 1964.
২৮. ইবনে আসাকির, তাহযীব তারীখ, দামিশক ১৩৪৯ হিঃ, খ. ৬, পৃঃ ৩০৬।
২৯. মাকারিমুল আখলাক-এর বরাতে তাফহিমুল কুরআন (লাহোর ইদারাই তরজমানুল কুরআন, ১৯৭৪) ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।
৩০. Montogomery Watt W. The Majesty that was Islam. Siduick and Jackson. London 1974, P. 47.

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ৪৩-৫৫

ইসলামী শরীয়তের লক্ষ :

শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায়

ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম

॥ এক ॥

আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকা, রসূলের বাণী প্রচার করা এবং দুনিয়াবাসীর তাঁর আনুগত্য করা সফলকাম দলের নির্দশন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাবলীগ বা প্রচার হতে হবে হুবহু শব্দের এবং সঠিক অর্থ ও তাৎপর্যের আর যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক সেভাবেই। এ ব্যাপারে আলেমগণ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন :

তাদের একটি দল হলো, কুরআন ও হাদীসের হাফেজগণ। তাঁরা দীনের উৎসের সংরক্ষণ করেছেন এবং পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে তাদেরকে এমনভাবে রক্ষা করেছেন যার ফলে মানুষের কাছে তা সবরকমের আবর্জনা ও কলুষমুক্ত হয়ে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রূপে পৌছে গেছে।

দ্বিতীয় দলটি হলো, ফিকহশাস্ত্রবিদগণ। তাঁরা আহকাম ও আইন কানুন নির্ধারণ করে হালাল ও হারামের বিধান বেঁধে দেন। তার আলোকে জনগণকে ফতওয়া বা দিক দর্শন দিয়ে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা পৃথিবীর মাটিতে আকাশের তারকা যেমন। তাঁদের মাধ্যমে অন্ধকারে পথহারা মানুষেরা পথে দিশা পায়। মানুষ পানাহারের চাইতেও তাদের বেশি মুখাপেক্ষী। তারাই হচ্ছেন মুজতাহিদ। রসূলের স. ইন্তিকালের পর আল্লাহর দীনের আহকাম প্রচারের গুরুদায়িত্ব তাঁরাই সার্থকভাবে পালন করেন। তাঁরা অত্যন্ত আস্থা ও সতর্কতার সাথে তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেন। অন্যথায় দীনের তাবলীগের কাজ যথাযথ মর্যাদায় বিরাজমান থাকা সম্ভবপর হতো না।[১৬]

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, জ্ঞান লাভ না করে কোনো বস্তুর হালাল বা হারাম হওয়ার কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। আর এ জ্ঞান অর্জন করতে হবে কুরআন ও হাদীস অথবা ইজমা ও কিয়াস থেকে।[১৭]

তাছাড়া একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা নির্ভর করে শাব্দিক ও অর্থগত দিক দিয়ে আরবী ভাষা জানা, নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসুখের (রহিত) পরিচয় লাভ করা এবং ফরয, আদাব-কায়দা, নির্দেশ ও অনুমোদন সম্পর্কে জানার ওপর। অর্থাৎ যে নির্দেশটি মূলত ওয়াজিব এবং যে নির্দেশটি পদ্ধতিগত কারণে ওয়াজিব আবার যে নির্দেশটি দলিলের ভিত্তিতে ওয়াজিব নয়– সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

আরো জানতে হবে অবকাঠামো সম্পর্কে। পরম করুণাময় আল্লাহ মর্তের মাটিতে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন এবং মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত যে আহকাম অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোর অবকাঠামোগত রহস্য কি? যাবতীয় ফরয কাজ দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য কি সমগ্র মানব জাতি অথবা কোনো মানুষ? মানুষের জন্য যেসব আনুগত্য ফরয করা হয়েছে এবং তাঁর নির্দেশের যেখানে সমাপ্তি ঘটেছে ইত্যাদি বিষয়ের অবকাঠামোগত দিকের পরিচয় লাভ করা কি এর উদ্দেশ্য? পাপাচার থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে, অলসতা ও জড়তা দূরীকরণে এবং আল্লাহর সুস্পষ্ট আনুগত্যের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ যেসব উপমা ও রূপক বর্ণনা করেছেন সেগুলো সম্পর্কে জানা এবং কল্যাণকর নফল কাজ অধিক পরিমাণ করাও এর অন্তরগত।

আর কিয়াস (অনুমান) হলো, কুরআন বা হাদীসের প্রথম সংবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল দলীল অন্বেষণ করা। কারণ কুরআন ও হাদীস হচ্ছে চিরন্তন সত্য এবং এর অন্বেষণ করা ফরয। এই সামঞ্জস্য দুভাবে হতে পারে :

এক. আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. কোনো জিনিস হারাম করেছেন কিংবা কোনো অর্থে সেটিকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। এখন আমরা যদি অনুরূপ অর্থবোধক এমন কোনো জিনিস পেয়ে যাই যার ওপর কুরআন বা হাদীসের হুবহু দলিল প্রযুক্ত নয়, তাহলে কুরআন বা হাদীসের পূর্ববর্তী নির্দেশের উপর কিয়াস করে আমরা সে জিনিসটিকে হারাম বা হালাল বলতে পারি।

দুই. এমন জিনিস পাওয়া যা আগের পাওয়া জিনিস থেকে ভিন্নতর এবং আগের পাওয়া দুটি জিনিসের কোনো একটির কাছাকাছি অনুরূপ জিনিসও পাওয়া না গেলে এই জিনিসের সাথে অনুরূপ জিনিস সম্পৃক্ত করতে হবে। যেমন শিকারীর প্রতিদান।[১৮]

কাজেই কিয়াসের বাস্তবতা প্রচলনের জন্য কুরআন বা হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল খবর (দলিল) অন্বেষণ করা মুজাতাহিদের উদ্দেশ্য। কারণ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান চিরন্তন এবং মহাসত্য বলে সমাদৃত ও গণ্য। এ চিরন্তন জ্ঞান সমৃদ্ধ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুর নিকট থেকে এনেছেন।

দালালাতুন নস্ (দলিল ভিত্তিক সুস্পষ্ট নির্দেশ) দুই প্রকার : মৌলিক ও আপেক্ষিক (Relative)। বক্তার (মুতাকাল্লিম) উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার অধীন হয়ে থাকে মৌলিক নস। মৌলিক নসের ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। অন্যদিকে আপেক্ষিক নস শ্রবণকারীর বুদ্ধিশক্তি, বোধশক্তি, চিন্তা-গবেষণার তীক্ষ্ণতা ও মেধাশক্তির প্রখরতা এবং শব্দাবলী ও শব্দবিন্যাসের পরিচয় ইত্যাকার বিষয়ের অধীন। উপরোক্ত বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সকল শ্রবণকারীর মধ্যে সমভাবে পরিদৃষ্ট না হওয়ার কারণে এ ধরনের দলিল উপস্থাপনে শ্রবণকারীদের গুণাবলীর পার্থক্য অনুপাতে মতভেদ হয়ে থাকে।

এ ধরনের প্রকারভেদ কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন করার ব্যাপারে সাহাবাগণের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার রহস্য আমাদের সামনে তুলে ধরে। সাহাবাদের অনেকে হাদীস বেশি সংরক্ষণ এবং বেশি

পরিমাণে রেওয়ায়েত করেছেন। অথচ তাঁদের মতো যারা বেশি বেশি হাদীস সংরক্ষণ ও রেওয়ায়েত করেননি তাঁরা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তত্ত্বজ্ঞান অনুধাবন করেছেন।[৯৯]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করছি। সেটা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শ্রবণকারী বক্তার উদ্দেশ্য পরোক্ষ শ্রবণকারীর তুলনায় বেশি সচেতনভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। আবার কখনো প্রত্যক্ষ শ্রবণকারীর চেয়ে পরোক্ষ শ্রবণকারী বেশি সচেতন হয়ে থাকে। তবে এরূপ ঘটনা বিরল এবং কদাচিত ঘটে থাকে। এ কারণে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য সাহাবাগণই বেশি জানতেন ও বুঝতেন। পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

বক্তা তার মনের বাসনা কখনো কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। কখনো এই অব্যক্ত বাসনা তার অভ্যাস ও আচরণের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। আবার কখনো তার প্রকাশ বক্তার পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। যদি কেউ বলে, আমি বাগদাদ যাচ্ছি, তাহলে তার কথায় বুঝতে হবে যে, সে বাগদাদ যাচ্ছে। তবে যাওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ অজ্ঞাত। আর যদি সে বলে, আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাচ্ছি, তাহলে তার কথার উদ্দেশ্য জানা গেলো। এ উদ্দেশ্য আবার লোকটির অভ্যাস ও আচরণের মাধ্যমেও জানা যায়। যেমন লোকটি কেবল বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই বাগদাদ ভ্রমণ করে থাকে। আবার লোকটির কথাবার্তা, পরিবেশ পরিস্থিতি এবং কর্মতৎপরতায় এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, লোকটি বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত করার জন্যই বাগদাদ যাচ্ছে।

শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলীর সাথে পরিচয়ের পন্থাগুলোর উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, আমাদের কথা শুধুমাত্র তিনটি পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। এক. সুস্পষ্ট দলীল। দুই. বিধিসম্মত অভ্যাস ও আচার অনুষ্ঠান। তিন. শরীয়ত বুঝার ব্যাপারে সাহাবাদের দিকদর্শন।

প্রথম পদ্ধতি : কারণ ভিত্তিক সুস্পষ্ট দলীল

একথা সবাই জানে যে, শরীয়ত প্রণেতার হুকুম কাজের দাবী অনুযায়ীই হয়ে থাকে। হুকুমের মর্মানুযায়ী কাজের বাস্তবায়ন শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে কাজের দাবী ঋণাত্মক বা বিরত থাকা হলে সেটা হবে নিষেধাজ্ঞা। সে অবস্থায় কাজের বাস্তবায়ন না হওয়াই শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য এবং কাজের বাস্তবায়ন হবে উদ্দেশ্য বিরোধী। যেমন আদিষ্ট বা নির্দেশিত জিনিসের অনুকরণ না করা উদ্দেশ্য বিরোধী। যারা কার্যকারণের প্রতি লক্ষ না করে শুধুমাত্র 'আমর' বা 'নাহী' এর ওপর নির্ভর করে এবং যারা কার্যকারণ ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে তাদের কাছে উপরোক্ত কথাগুলো পরিষ্কার। যখন শুধুমাত্র 'আমর' ও 'নাহী' শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছা প্রমাণ করে তখন কার্যকারণসহ এ দুটি ইংগিত ও লক্ষণসমূহ যে তাঁর ইচ্ছা প্রমাণ করবে একথা সহজেই অনুমান করা যায়।[১০০]

একথা স্পষ্ট যে, আহকাম সম্বলিত আয়াত ও হাদীসসমূহের অধিকাংশই কার্যকারণের সাথে সম্পৃক্ত। এ ধরনের কতিপয় আয়াত ও হাদীসের বিবরণ নিম্নরূপ :

১. আল্লাহর বাণী : 'আর তোমরা যতদূর সম্ভব বেশি শক্তিমত্তা ও সদাসজ্জিত বাঁধা ঘোড়া নিয়ে তাদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হও, যাতে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারো।[১০১] এ আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে যুদ্ধংদেহী কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়। এক্ষেত্রে অভিষ্ট লক্ষ হলো, জিহাদের মাধ্যমে তাঁর দীনের সহায়তা করা, তাঁর কালেমা বুলন্দ করা এবং মুসলমানদের দেশ-ভূখণ্ড, জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করা।

২. আল্লাহ বলেছেন : 'হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটিই তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি।'[১০২]

তিনি আরো বলেছেন : 'আর যখন নবীর স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাইতে হয় তখন পরদার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য উত্তম পন্থা।'[১০৩]

তিনি আরো বলেছেন : 'আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা।'[১০৪]

আল্লাহ বলেছেন : 'আর তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।'[১০৫]

আল্লাহ আরো বলেছেন : 'তারা যেন বাক্যালাপে কোমলতা প্রকাশ না করে, যাতে দুষ্টমনের কোনো লোক লালসা করতে পারে।'[১০৬]

উপরের আয়াতগুলোতে ঈমানদার নর-নারীর অন্তর কলুষমুক্ত করার জন্য সবচেয়ে বেশি পবিত্র উপায় উপকরণ ব্যবহার করার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজের প্রতি। আর এরূপ পবিত্রতম উপায়ই বা হবে না কেন? কারণ আয়াতে উল্লেখিত উপকরণগুলো অশ্লীলতা, ফিতনা-ফাসাদ, হিংসা-দ্বেষ, সম্পর্কচ্ছেদের তৎপরতা ইত্যাকার যাবতীয় অসৎকর্মের পথরোধ করে। মহান আল্লাহ উপরোক্ত উপায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এ ধরনের বিপর্যয় দমনের ব্যবস্থা করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষের বংশধারা, ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও প্রাণের হেফাজত করা।

৩. আল্লাহ বলেছেন : 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর নাপাক শয়তানের কাজ। তোমরা এগুলো পরিহার করো। তাতে তোমরা সাফল্য লাভের আশা করতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'[১০৭]

মদপান থেকে বিরত রাখার কারণ বিবিধ। বৈষয়িক ও নৈতিকতার দিক দিয়ে মদপানের পরিণাম এতটা ভয়াবহ যে, বিবেকবান ও চক্ষুস্মান ব্যক্তিমাত্রই তা বুঝতে সক্ষম। কারণ সূরা বাকারার আয়াতে আল্লাহ নিজেই বলেছেন : মদপানের উপকারিতার চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশি।

৪. আল্লাহ বলেছেন : 'আল্লাহ এই জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রসূলের, রসূলের স্বজনগণের এবং ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।'[১০৮] আয়াতে উল্লেখিত খাতে ধন-সম্পদ বন্টন করে দেয়ার কারণ হলো : এর ফলে ধন-ঐশ্বর্য অভাবগ্রস্ত, ফকির, মিসকিনদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হবে না। কারণ ধনবানদের মধ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত ও কেন্দ্রীভূত হওয়ায় অভাবগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিকর, এমনকি ধনীদের জন্যও।

উপরোক্ত আয়াতগুলো ছাড়াও আরো আয়াত রয়েছে যেগুলোর আহকামের কারণ সুস্পষ্টভাবে কিংবা ইশারা ইংগিতে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কার্যকারণ সম্বলিত হাদীসও রয়েছে। যেমন :

১. যেসব ইমাম সালাতে দীর্ঘ সূরা পাঠ করেন তাদের জন্য হুমকি স্বরূপ রসূলের বাণী : 'হে লোকেরা! তোমরা বিচ্ছিন্নকারী। তোমাদের কেউ সালাতের ইমামতি করলে কিরআত হালকা বা নাতি দীর্ঘ হওয়া উচিত। কারণ জামায়াতে রোগী, দুর্বল এবং তারাও আছে যাদের বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন।[১০৯]

এ হাদীসটি বাস্তব উপলব্ধির কারণসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।[১১০] হাদীসটিতে একথারও ইংগিত রয়েছে যে, দীনের ভিত্তি হলো সহজতার ওপর। সৎকাজ যখন কল্যাণ বিনষ্টকারী হয় অথবা মানুষের হক নষ্ট করে তখন তা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যায়। কারণ এ ধরনের কাজ ত্রুটি, অলসতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম তার বিয়ে করা উচিত। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে আনত করে এবং গুপ্তাংগের হেফাজত করে। আর যে সক্ষম নয় তার রোযা রাখা উচিত। কারণ রোযা তার জন্য হাতিয়ার।'[১১১]

উপরোক্ত হাদীসে বিবাহিত জীবন যাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিয়ে করার নির্দেশ রয়েছে। মানুষের জন্য কল্যাণকর জীবন পদ্ধতির ব্যাখ্যাও হাদীসে দেয়া হয়েছে। এখানে কল্যাণের যে উপকরণগুলোর কথা বলা হয়েছে তা হলো : দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করা। মহান আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে এ দুটির হেফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুটির হেফাজতের মধ্যে অনেক কল্যাণ ও সফলতা নিহিত আছে। বেশির ভাগ পাপকাজ এ দুটি থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। বৈবাহিক জীবন যাপনের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম ব্যক্তির জন্য যে চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা দিলেন তা একটু ভিন্ন রকমের এবং তা হচ্ছে সাউম বা রোযা রাখা। কারণ রোযা বিবাহে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তার যৌন ক্ষুধাকে প্রদমিত করতে সহায়তা করবে।

৩. মুগীরা ইবনে শুবা বিয়ে করার ইচ্ছা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন : 'তোমার হবু স্ত্রীকে দেখে নাও। কারণ তোমার এ দেখা তোমাদের দুজনের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টিতে অধিকতর সহায়ক হবে।'[১১২] হাদীসের শব্দ 'আহরা' অর্থ হচ্ছে অধিকতর যোগ্য, সবচেয়ে ভালো, যথোপযোগী ইত্যাদি। আর 'ইউদামু' শব্দের অর্থ আকর্ষণ, আন্তরিকতা ইত্যাদি। হাদীসটিতে

পাত্রীকে পাত্রের নিজের দেখার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ পাত্রীকে দেখতে গিয়ে উভয়ের দেখার কাজ হয়ে যায় এবং এর ফলে শুভ কার্য সম্পন্ন হলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা চিরন্তন ও সুখের হয়। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার এটাই শরীয়ত প্রণেতার মৌল উদ্দেশ্য।

৪. স্ত্রীর খালা বা ফুফুকে বিয়ে না করার কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। খালা বা ফুফু শ্বাশুড়িকে বিয়ে করা খুবই ক্ষতিকর। কারণ তাতে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। হাদীসে বলা হয়েছে : 'যদি তোমরা এটা করো তাহলে তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।' ইবনে আদি থেকে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে এরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, যখন লোকটি স্ত্রী ও তার খালা বা ফুফুর সাথে সংগম করবে তখন তারা দুজন পরস্পরের সতীন হয়ে যাবে। ফলে তাদের আত্মীয়তা তথা ফুফু-ভাতিজীর যে বন্ধন ছিল তা আর অক্ষুণ্ন থাকবে না। ইবনে হিব্বান থেকে অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে : স্ত্রীর ফুফু বা খালাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। তিনি বলেছেন : 'তোমরা যখন এরূপ করবে তখন তোমাদের আত্মীয়তা বা রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।'[১১৩]

জাতীয় ঐক্য ও পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করাই শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য। অনৈক্য ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যবিরোধী। কাজেই স্ত্রীর বর্তমানে তার খালা-ফুফুকে বিয়ে করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এবার আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যেতে চাই।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : শরীয়ত প্রণেতার রীতি ও হস্তক্ষেপ অনুসন্ধান করা

এটি হলো জানার জন্য অনুসন্ধান করা। ইয্ ইবনে আবদুস সালাম প্রণীত 'কাওয়ায়েদুল আহকাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করার জন্য শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলী অনুসন্ধান করে সে সমগ্র ব্যবস্থা থেকে একটা বিশ্বাস বা পরিচিতি লাভ করে। এ ধরনের কল্যাণকে গুরুত্বহীন মনে করা ঠিক নয় এবং একেবারে বিসর্জন দেয়াও জায়েয নয়। এ ব্যাপারে নস্, কিয়াস ও ইজমা নেই তবুও শরীয়তের অন্তরনিহিত জ্ঞান ও বোধ একে ওয়াজিব করে তোলে।[১১৪]

শরীয়তের অন্তরনিহিত জ্ঞান শরীয়ত প্রণেতার অভীষ্ট কল্যাণ-অকল্যাণ চেনার ব্যাপারে সুতীক্ষ্ণ দক্ষতার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে এ দক্ষতা শরীয়ত প্রণেতার হস্তক্ষেপের অনুসন্ধান ছাড়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। আর শাখা প্রশাখা হতে অনুসন্ধান শরীয়ত প্রণেতার সঠিক ও ব্যাপক উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। অনুসন্ধান কাজটি দু'প্রকার :

প্রথম প্রকার : আহকাম জানার জন্য অনুসন্ধান। আহকাম সম্পর্কিত আমাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে আহকামের কারণসমূহ জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় অনুসন্ধানের কাজ কার্যকারণ নিরূপণের পদ্ধতিতে প্রমাণিত কারণ অনুসন্ধানের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। কারণ কার্যকারণ অনুসন্ধানের

মাধ্যমে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য সহজে জানা যায়। কেননা যখন আমরা সমপর্যায়ের অনেকগুলো কারণ সম্বন্ধে সম্মিলিত কৌশলের একটি নিয়ম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করি তখন একটি মাত্র কৌশলের জন্য সেগুলোকে নির্দিষ্ট করা আমাদের জন্য সম্ভব হয়। ফলে আমাদের নিরূপিত কৌশলটিই বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য বলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। যেমন তর্কশাস্ত্রের নীতি অনুসারে শাখা-প্রশাখার অনুসন্ধানে একটি ব্যাপক অর্থ অর্জিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :

১. ইশারা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা মাযাবিনা (অজানা কেনা-বেচা) জাতীয় বেচা-কেনা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ জানতে পারি। এ সম্পর্কিত হাদীসটি হলো : এক ব্যক্তি শুকনা খেজুরের বিনিময়ে পাকা খেজুর বিক্রি করা যায় কিনা জিজ্ঞেস করলে নবী স. বলেন : 'শুকনা খেজুর কি কমে যায়? প্রশ্নকারী বললেন, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, তাহলে এরূপ করার অনুমতি নেই।' হাদীসটিতে ইংগিতে 'মাযাবিনা' হারাম হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। কারণটি হলো : অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত বস্তুর বিনিময়ে অথবা একজাতীয় অজ্ঞাত বস্তু অজ্ঞাত বস্তুর বিনিময়ে লেনদেন হওয়া। কারণ এক্ষেত্রে দেখা যায়, বিনিময়কৃত দুটি বস্তুর একটির পরিমাণ অজানা। অর্থাৎ কাঁচা খেজুর শুকানোর পর কমে যায়। কমে যাওয়ার পরিমাণ অজানা থাকায় বেচাকেনা কার্যক্রম হারাম হয়ে যায়।[১১৫]

অনুমানের ভিত্তিতে বেচাকেনা করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ আমরা গবেষণা ও উদ্ভাবন পদ্ধতির মাধ্যমে জানতে পারলাম। কারণ হলো, বিনিময়কৃত বস্তুর একটির পরিমাণ অজ্ঞাত থাকা। আর শরীয়ত প্রণেতার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব প্রতারণা থেকে রক্ষা করা।[১১৫ক] এমনিভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন–'প্রসব না করা পর্যন্ত পশুর পেটে যা আছে তার বেচাকেনা করা, পরিমাপ ছাড়া স্তনের দুধ বিক্রি করা, পলাতক দাস-দাসীর কেনা-বেচা করা, বন্টনের আগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিক্রি করা, গ্রহণের আগে সাদকায় পাওয়া মাল বিক্রি করা, মনিমুক্তা আহরণ করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ডুব দেয়ার শ্রম বিক্রি করা।'[১১৬] এ জাতীয় বেচাকেনায় অজ্ঞতা ও প্রতারণা থাকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এক পক্ষ তা মেনে নিতে সক্ষম হয় না। মুনিমুক্তা আহরণ করার উদ্দেশ্যে সাগরে ডুব দেয়ার বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, ডুবুরী এভাবে চুক্তি করে : আমি সাগরে এতগুলো ডুব দেবো, তাতে যা পাওয়া যাবে সব তোমার এবং এই সম্পদের বদলে আমাকে এত টাকা দিতে হবে। এর মধ্যে প্রতারণা ও অজ্ঞতা থাকার কারণে এ ধরনের বেচাকেনা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।[১১৭]

উপরোক্ত জিনিসগুলো ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণসমূহ জানার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে, শরীয়ত প্রণেতার এখানে যে একটি মাত্র লক্ষ তা হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ যেন প্রতারণার শিকার না হয়। কাজেই যেসব পণ্য বা বিনিময় দ্রব্য অথবা সময় নির্ধারণে প্রতারণা, বিপদ ও অজ্ঞতা থাকবে সেগুলোর বিনিময় বাতিল গণ্য হবে।[১১৮]

অবশ্য আলেমগণ কতিপয় প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন এ কারণে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলোর দলিল পরস্পর বিরোধী অথবা প্রতারণার নিয়ম

থেকে তা ভিন্ন ধরনের কিংবা পণ্যদ্রব্যটি আসলে প্রতারণামূলক হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[১১৯]

প্রতারণা হলো, শরীয়ত প্রণেতার নির্ধারিত সীমা সহজে লংঘন করা। এ কষ্টদায়ক বিষয়টি থেকে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ। কাজেই 'মাযাবানাহ' তথা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া নিসন্দেহে একটি কল্যাণমুখী কৌশল। এ থেকে আমরা একথা জানতে পারি যে, ক্রেতা-বিক্রেতাকে যথাসম্ভব প্রতারণা থেকে রক্ষা করাই শরীয়ত প্রণেতার মূল লক্ষ। আর এর সুদূরপ্রসারী ও সর্বসম্মত উদ্দেশ্য হলো ধনসম্পদ সংরক্ষণ করা।

২. আমরা জানি একজন মুসলমান ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অপর ভাইয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করা নিষিদ্ধ। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'একজন মুমিন অন্য মুমিনের ভাই। কাজেই একজন মুমিন তার অন্য মুমিন ভাইয়ের ক্রয়ের ওপর প্রতিযোগিতামূলক দরাদরি করবে না যতক্ষণ না সে পণ্যদ্রব্যটি পরিহার করে এবং অপর ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাব দেবে না যতক্ষণ না সে তার প্রস্তাব তুলে নেয়।'[১২০] এক্ষেত্রে নিষেধ করার কারণ হলো, এ ধরনের প্রতিযোগিতা করার কারণে প্রতিহিংসা, বিচ্ছিন্নতা, অসহযোগিতা, অবজ্ঞা ইত্যাকার অসৎ গুণাবলী প্রসার লাভ করে। ফলে মুমিন ভাইদের মধ্যে যে চিরন্তন ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বিদ্যমান থাকার কথা তা ব্যাহত হতে বাধ্য হয়। মানুষের কল্যাণকর ও সুখময় জীবন যাপনের অভীষ্ট লক্ষ অর্জন করাই এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার মৌল উদ্দেশ্য। এক ভাই পণ্যদ্রব্য কেনার আশায় বিক্রেতার সাথে আলাপ করছে কিংবা এক ভাই কোনো মেয়েকে বিয়ে করার অভিপ্রায়ে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। প্রথম ব্যক্তির সাথে বিক্রেতার বা মেয়েটির একটি ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কারোর এ ব্যাপারে দর কষাকষি করা কিংবা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির মহিলার পাণি প্রার্থী হওয়ার কথা বলা হারাম। কারণ এ ধরনের প্রতিযোগিতার ফলে মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্কে ফাটল ধরতে বাধ্য। এ ধরনের প্রতিযোগিতা গীবত, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাকার সব ধরনের অসৎ কাজের মতই অনিষ্টকর। এ অনিষ্টকারিতা ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে কিংবা পারস্পরিক সহযোগিতা ও কার্যক্রমেও হতে পারে। খালা শাশুড়ি ও ফুফু শাশুড়িকে বিয়ে করাও এ পর্যায়ের অন্যায়ের মধ্যে গণ্য। কারণ তার ফলে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট থাকে না।[১২১]

এ ধরনের প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ করে শরীয়ত প্রণেতার মানব জীবন সংরক্ষণ করার সাধারণ ইচ্ছাকেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে। কারণ প্রতিহিংসা ও ক্রোধ অনেক সময় মানুষকে হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য ক্ষতিকর কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে হিংসা ও ক্রোধ সৃষ্টি হতে পারে সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করে তার মর্মমূলে আঘাত হানা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার : জানার জন্য অনুসন্ধান। একক উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত আহকামের দলিল অনুসন্ধান করা। উদাহরণের সাহায্যে আমরা এগুলো সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।

১. ক্রীতদাস ও তাদের মুক্তি সংক্রান্ত অবতীর্ণ আহকামের দলিলগুলো নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করি তখন এগুলোকে একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যাভিসারী দেখি। এটি কিতাবাত, তাদবীর, উম্মে ওয়ালাদ (সন্তান জন্মদানকারী ক্রীতদাসী), কোনো সংখ্যায় বা শর্তের চুক্তি ছাড়া মুক্ত করার অনুমোদন, স্বাধীন পুরুষের ক্রীতদাসীকে বিয়ে করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা যদি স্বাধীন পুরুষদের যথেষ্ট সমর্থ থাকে ইত্যাকার বিষয়ের আহকামের অনুরূপ।

কোনো কোনো কাফফরায় দাসদাসী মুক্ত করাকে ওয়াজিব করা, এমন নিকটবর্তী দাসদাসী মুক্ত করাকে যাকাতের ব্যয়খাতের অন্তরভুক্ত করা যারা শুধুমাত্র যাকাতদাতার মালিকানায় প্রবেশ করেছে এবং অংশীদারীত্বের ক্ষেত্রে অর্ধেক মূল্য আদায় করার পর পূর্ণ মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে অবশিষ্টাংশের মূল্য আদায় করার জন্য অংশীদারকে তাগিদ দেয়া এবং ক্রীতদাসের সম্মতির তদারকী ছাড়া মুক্তির আদেশ জারি করা ইত্যাদি আহকাম দাসদাসীদের মুক্ত করার ব্যাপারকে উৎসাহিত করা তথা আল্লাহর নৈকট্যলাভের উপায় উপকরণ বৈকি।

দাস-দাসীদের মুক্ত করা সম্বলিত অধিকাংশ দলিল এবং এ বিষয়ের উপর শরীয়তের অন্যান্য কার্যক্রমের মূল লক্ষ হলো গোটা মানব সমাজ মুক্ত ও অবাধ জীবন যাপন করবে। শরীয়ত প্রণেতার এই লক্ষকে সামনে রেখে ফিকহশাস্ত্রবিদগণের বিরাট অংশ স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা স্বাধীনতাকে দাসত্ব ও অধীনতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ মানুষ মূলগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। দাসত্ব ও অধীনতা সাময়িক বা অনন্যোপায় অবস্থার একটি ব্যবস্থা মাত্র।[১২২]

২. খাদ্য জাতীয় দ্রব্যের মজুতদারী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য মজুতদারী করবে সে অপরাধী গণ্য হবে।'[১২৩] বাজারে খাদ্য জাতীয় দ্রব্যের অভাব সৃষ্টি করে জনগণের ক্ষতি সাধন করার পথ রোধ করার উদ্দেশ্যেই মজুতদারী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এগিয়ে গিয়ে বিক্রেতাকে প্রলুব্ধ করা এবং বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত করার আগেই বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এর ফলে বাজারে খাদ্যদ্রব্যের অবাধ চলাচলের ওপর প্রভাব বিস্তার করা হয়। কোনো কোনো আলেমের মতে বাকিতে খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করা এজন্য নিষিদ্ধ যে, তাতে খাদ্য একজনের জিম্মায় চলে যায় এবং বাজারে তার চলাচল (Circulation) বন্ধ হয়ে যায়। অনুরূপ কারণে গ্রামবাসীর মধ্যস্বত্বভোগী দালালের হাতে পণ্য বেচাকেনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১২৪]

এ ধরনের অনুসন্ধানের জন্য উপরোক্ত দলিলগুলো পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারলাম, খাদ্য জাতীয় দ্রব্যের চলমানতা এবং এগুলোর সহজলভ্যতা শরীয়ত প্রণেতার অভীষ্ট লক্ষ। এই লক্ষ বিশ্লেষণ করে আমরা বলবো : বাজারের প্রচলিত রীতি পণ্য বিনিময়ের একটি পদ্ধতি। দ্রব্যের ঘাটতি হওয়াও একটি পদ্ধতি। কারণ বিনিময় ছাড়া মানুষ বেচাকেনা পরিত্যাগ করে না। ফলে খাদ্যদ্রব্যের চলমানতা রহিত হওয়ার ভয় থাকে না। কাজেই তারা অংশীদারিত্ব অভিভাবকত্ব এবং খাদ্যপণ্য হস্তগত করার আগে চুক্তি ভংগকারী জায়েয বলতেন।[১২৫]

ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত উপরোক্ত দলিলের সমন্বয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা শরীয়ত প্রণেতার পাঁচটি শরয়ী উদ্দেশ্যের সার্বিক লক্ষে পৌছুতে সক্ষম যেগুলো শরীয়ত প্রণেতার সমগ্র বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলীকে কেন্দ্রীভূত করে থাকে। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোকপাত করবো।

এ বিষয়ে উপরোক্ত উদাহরণ দিয়ে ক্ষান্ত হলাম। এবার তৃতীয় ও শেষ পদ্ধতি অর্থাৎ শরীয়ত প্রণেতার বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্যসমূহের সাথে পরিচয় লাভের ব্যাপারে সাহাবাগণের হেদায়াত সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।

তৃতীয় পদ্ধতি

কুরআন ও হাদীসের আহকাম বুঝা এবং সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাহাবাগণের অনুসরণ করা আর তাঁদের হেদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ করা হলো শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলীর সাথে পরিচয় লাভের তৃতীয় সোপান। কারণ তাঁরা ছিলেন বিশ্বাসে দৃঢ়, ভাষায় সমৃদ্ধ, বর্ণনায় পরিপক্ক, কুরআন অবতীর্ণ কালের সমসাময়িক এবং কুরআনের বিবরণ করার জন্য প্রযোজ্য রসূলের বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

তাঁরা ছিলেন অনন্য স্মৃতি শক্তি ও প্রখর মেধার অধিকারী। মননশীলতা, পবিত্রতা, আন্তরিকতা, পরিশীলিত মানসিকতা ছিল তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট। শরীয়ত তথা ইসলামের জন্য তারা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন উপমার অধিকারী। তাঁরা ছিলেন জাতির কর্ণধার, মুজতাহিদদের সিপাহসালার, বিজ্ঞজনদের পথিকৃত এবং সৃষ্টির সেরা। ন্যায় নীতির ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন অতুলনীয়। কাজেই তাঁদের কর্মকতৎপরতা ছিল সর্বজন গৃহীত ও নন্দিত।

ইবনে কাইয়েম তাঁর 'আলামুল মুওয়াক্কিয়ীন' গ্রন্থে বলেন : 'নবীর স. কথা ও কাজ বুঝার ও আনুগত্যের ব্যাপারে সাহাবাগণ ছিলেন উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যোগ্যতার অধিকারী। তাঁরা রসূলের উদ্দেশ্য ও লক্ষের বেস্টনীর সবচেয়ে কাছে অবস্থান করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য তাঁরা সরাসরি বুঝতে পারতেন। উদ্দেশ্য বুঝার জন্য তাদের কারোর কিছু প্রকাশ করার দরকার হতো না। কখনো শব্দের সাধারণ প্রয়োগ আবার কখনো কার্যকারণ সাধারণ হওয়ার মাধ্যমে বক্তার উদ্দেশ্য জানা যায়। তবে শব্দের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় ধরনের পদ্ধতিকে অধিকতর সুস্পষ্ট মনে করা হয়।[১২৬]

শাহ ওয়ালিউল্লাহর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'আহকাম ভিত্তিক উদ্দেশ্য সমূহের পরিচয় লাভ করা একটি সূক্ষ্ম কাজ। তীক্ষ্ণ মেধা ও দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া এগুলোর রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। সাহাবীগণের মধ্যে যারা ফকীহ ছিলেন তাঁরা সৎকাজ এবং আরব দেশীয় মুশরিক, ইহুদী, নাসারাদের মতো জাতীয় ঐকমত্য ভিত্তিক বদকাজের হেতুগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম বস্তুর সাথে পরিচয় লাভের প্রয়োজনীয়তা তাদের জন্য দেখা দেয়নি।

অবশ্য শরীয়তের বিধি-বিধান ও দীনের হুকুম-আহকাম বিধি-নিষেধের প্রত্যক্ষদর্শীগণ সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন চিকিৎসা বিশারদগণের ওষুধ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যের পরিচিতি সর্বোচ্চ ধরনের পরিচয় বলে গণ্য হয়ে থাকে।[১২৭]

যে ব্যক্তি কোনো নীতিবান লোকের কথার প্রতি অতি উৎসাহী ও আগ্রহী সে তার নীতি ও আচরণের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং তিনি অমুক অমুক বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন বা কথা বলেছেন বলে বর্ণনা করতে পারে। আর যদি তার কথায় স্পষ্টভাবে কিছু না জানা যায় তাহলে সে বলবে না যে, তিনি অমুক ফতোয়া দিয়েছেন বা কথা বলেছেন। ইমামগণসহ তাদের সমস্ত অনুসারীদের অবস্থা যখন এই পর্যায়ের তখন তারা কেমন করে জাতির হেদায়াতের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর বাহক হবেন? কাজেই যিনি নেতৃত্ব দেবেন তাঁকে নীতি নির্ধারকের কথা ও আদিষ্ট বস্তু উপলব্ধির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের অধিকারী হতে হবে।

শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার সূচনালগ্ন থেকে তার পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত সাহাবাগণ ছিলেন শরীয়তের জন্য নিবেদিত এবং তার সাহায্যকারী। যেমন আল্লাহ বলেছেন : 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দীন হিসাবে ইসলামের উপর আমি রাজি হলাম।'[১২৮] আল্লাহর ইচ্ছার সাথে পরিচিতির ব্যাপারে সমগ্র মানব সমাজে তাঁদের নজির নেই। তাঁদের মাধ্যমে শরীয়ত পৌছে যায় তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী ও পরবর্তী এবং আজকের প্রজন্মের কাছে।

শরীয়তের উৎস, উপকরণ ও তার আহকামের ভিতর বাহির এবং শরীয়ত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার ব্যাপারে সাহাবাদের ছিল অসাধারণ জ্ঞান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কল্যাণের স্বার্থে তাৎপর্য, আহকাম ও সমন্বিত কার্যকারণের অনুসরণ করতেন। কাজেই তাঁর নির্ধারিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য তাৎপর্যে ধাবিত হওয়ার সুযোগ নেই।[১২৯]

সাহাবাগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শরীয়ত প্রণেতার বিধান থেকে তাঁরা যে অর্থ অনুধাবন করেছেন তারই ভিত্তিতে তিনি তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করা বৈধ করেছেন। 'আমার বুদ্ধির ভিত্তিতে আমি ইজতিহাদ করবো' হযরত মুআয রা. এর এ উক্তির উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌন সমর্থনই এর প্রমাণ। এর অর্থ হলো, যুক্তিসংগত তাৎপর্য একত্র হলে নজির ও সমতার ভিত্তিতে বিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ কারণে সাহাবীগণের ইজমা শরীয়তের কিয়াস ভিত্তিক একটি দলিল।[১৩০] শরীয়ত প্রণেতা কখনো কার্যকারণ উল্লেখ করে আইনের ব্যাখ্যা দেন। আবার কখনো এমন ব্যাখ্যা করেন না। তবে শরীয়তের উৎসসমূহ অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন কার্যকারণের সাথে পরিচিতি লাভের মাধ্যমে মানুষ শরীয়তের বিধান প্রয়োগের তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হয়।

কোনো ব্যক্তি তার কর্মচারীকে বললো, অমুককে মারো কারণ সে আমার টাকা চুরি করেছে। এক্ষেত্রে মারার কারণ সুস্পষ্ট। আর যদি সে বলে, অমুককে মারো। কিন্তু সেখানে মারার কারণ

উল্লেখ নেই। তাহলে উপস্থিত লোকদের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে, নিশ্চয়ই লোকটি তাকে গালি দিয়েছে, তাই তাকে মারার হুকুম দিয়েছে। মারার হুকুমদাতা সম্পর্কে এরূপ ধারণা তখনই জন্মে যখন লোকদের পূর্ব থেকেই জানা থাকে যে, প্রতিশোধ নেয়া বা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে লোকটি যেমন কুকুর তেমন মুগুর নীতি অবলম্বনকারীদের দলভুক্ত। তবে লোকটি সম্পর্কে যদি সাধারণভাবে এরূপ পরিচিতি থাকে যে, অসৎ আচরণের বিপরীত সে সৎ আচরণ এবং হিংসার মোকাবিলায় স্নেহ ও সম্প্রীতির পথ অবলম্বন করে থাকে, তাহলে অমুককে মারার কারণ হিসাবে গালিগালাজ করার কথা প্রমাণ করা যাবে না। কারণ কার্যকারণ, হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজন অভ্যাসের বিভিন্নতার দরুণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

একজন দানশীল মুত্তাকী লোকের কাছে যখন একজন লোক বিনয়ী হয় তখন সম্ভাবনা থাকে তার তাকওয়ার দরুন লোকটি তার কাছ থেকে কিছু বরকত লাভ করবে। আবার দানশীল হওয়ার দরুন কিছু টাকা পয়সা লাভেরও সম্ভাবনা থাকে। বিনয় প্রকাশকারীর আনুগত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা ছাড়া কারণ নির্ণয় সম্ভব নয়। যদি বিনয়ী লোকটির অভ্যাসই হয় এভাবে পয়সা বাগানো, তাহলে তো তার বিনয় প্রকাশ ও খাতির তোয়াজ করার কারণ এটা হওয়া সহজেই অনুমান করা যায়। আর যদি বিনয়ী লোকটির প্রকৃতি হয় পরহেজগারী, তাকওয়া ও মুত্তাকী লোকের সাহচর্য নেয়া এবং মানুষের কাছে হাত পাতাকে ঘৃণ্য মনে করা, তাহলে তার বিনয়ের কারণ তাকওয়া ও দুনিয়ার লালসা না হওয়াই স্বাভাবিক। আর যদি বিনয় প্রকাশকারীর অভ্যাস ও প্রকৃতি অজানা থাকে তাহলে বিষয়টি সংশয়িত হয়ে থাকবে।[১৩১]

আহকামের অর্থ উপরোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়াই যুক্তিসংগত। সাহাবায়ে কেরাম কখনো দুটি ভালো জিনিসের ব্যাপারে বক্তব্যের স্বচ্ছতায় ও ভাষার অলংকারীত্বে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে তাদেরকে একত্র করেছেন। কুরআন ও সুন্নাতের শব্দ, অর্থ, উদ্দেশ্য, বাণী, কর্ম বিবরণী ও অনুমোদনের তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে লোকদের জন্য এটিই যথোপযুক্ত পদ্ধতি। সাহাবাগণের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাদের মতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল। যেমন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমি আমার রবের সাথে তিনটি বিষয়ে একাত্ম হয়েছি। তাঁদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যিনি তাঁর রায় উদ্ভাবন করেছেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম তাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। অথবা এমন সাহাবা আছেন যিনি নিজের রায়ের অনুকূলে রসূলের স. হাদীস পেয়েছেন এবং তার ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম নাসায়ী এবং অন্য হাদীস সংগ্রাহকগণও এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে রা. এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যার স্বামী মারা গিয়েছিল কিন্তু তার মোহরানা নির্ধারিত হয়নি। তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সিদ্ধান্ত পাইনি। ফলে এক মাস ধরে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকেন তারপর নিজে এ সম্পর্কে ইজতিহাদ করেন এবং এই সিদ্ধান্ত দেন যে, তার মোহরানা তার

আত্মীয়াদের মোহরানার সমপর্যায়ের। তার চেয়ে কম নয় এবং বেশিও নয়। তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে স্বামীর মীরাসও পাবে। একথা শুনে মা'কল ইবনে ইয়াসার উঠে দাঁড়ান এবং তিনি সাক্ষ্য দেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহিলার ব্যাপারে অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছিলেন। একথা শুনে ইবনে মাসউদ এত বেশি খুশি হলেন যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর অপর কোনো বিষয় তাঁকে এত বেশি খুশি করেনি।[১৩২]

কিছু কিছু বিষয়ে তাঁদের মতবিরোধ এ সত্যকে প্রভাবিত করে না। কারণ তাঁরা মানুষ ছিলেন। তাঁদের বুদ্ধি-জ্ঞান-উপলব্ধি, যুক্তি সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য ছিল। প্রত্যেক যুগ ও প্রতিটি প্রজন্মের এ ধারাই অব্যাহত আছে।

শরীয়ত অনুধাবন করা, তার আহকাম জানা এবং তার উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আদর্শ ও বিশ্বস্ত। এ ব্যাপারে কেউ তাঁদের কোনো ত্রুটি নির্দেশ করতে পারবে না। শরীয়তের তাৎপর্য অনুধাবন করা, তার বিধান উদ্ভাবন এবং বাস্তব অবস্থা ও ঘটনাবলীর ওপর তার প্রয়োগ অথবা তার নস মুলতবী করার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো ভুল চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তাঁদের এসব কিছু কল্যাণের স্বার্থে এবং অকল্যাণ ও বিপর্যয় প্রতিরোধে নিবেদিত।

অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

(বিঃ দ্রঃ অনিবার্য কারণে এ কিস্তির ফুটনোট দেয়া সম্ভব হয়নি।
আগামী সংখ্যায় দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।)

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ৫৬-৬২

ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

পাঁচ.

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পানি ব্যবহারের কারিগরি বৈশিষ্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পানির উৎস নির্মাণ সামগ্রীর সহজপ্রাপ্যতা, কারিগরদের দক্ষতা এবং অন্যান্য কারণে পানির সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়। ঝরনা, নদ-নদী, হ্রদ এবং ভূগর্ভস্থ পানি হচ্ছে এসব দেশে পানির প্রধান উৎস।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঝরনাকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার করা হলেও কোন কোন দেশে বাঁধ দিয়ে তার প্রবাহে কৃত্রিম উন্নতি সাধন করা হয়। এছাড়াও ঝরনার উৎসমুখ এবং নির্গমণ পথ পরিষ্কার করেও তার স্বাভাবিক ধারা অক্ষুন্ন রাখা হয়; ঝরনার নিম্নাঞ্চলে আধার তৈরি করে পানি সংরক্ষণের পদ্ধতিও কোথাও কোথাও চালু আছে। গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য বালতি বা কলসী জাতীয় পাত্রের মাধ্যমে সাধারণত নদীর পানি তোলা হয়; সেচ কাজের জন্য দেশীয় পদ্ধতির উত্তোলক যন্ত্র যেমন দোন, হেয়ত অথবা শক্তি চালিত পাম্পের ন্যায় যান্ত্রিক পদ্ধতিরও আশ্রয় নেয়া হয়। আবার বাঁধ দিয়ে পানি স্ফীত করে নালার মাধ্যমেও জমিতে পানি নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক দেশে আবার ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই কৃত্রিম জলাধার বা চৌবাচ্চা খনন করে বৃষ্টি বা নদীর পানি সংরক্ষণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ঝরনার ন্যায় হ্রদগুলোকেও তার স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। বেশির ভাগ দেশে কৃত্রিম পদ্ধতিতে খননকৃত পুকুর, দীঘি, খাল বিল প্রভৃতিতে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলাধারের পানি সংরক্ষণ করে রাখা হয়। কুয়া খনন, ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ তৈরি প্রভৃতির সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানি সংগ্রহের যে পদ্ধতি মুসলিম দুনিয়া শুরু করেছিল তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিশ্বে অগভীর ও গভীর নলকূপের প্রচলন হয়েছে এবং এগুলো এখন বিশুদ্ধ পানির প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। এই পানি সেচের কাজেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভূগর্ভে পর পর তৈরি সুড়ঙ্গে চুইয়ে জমাকৃত পানি পাইপ বা অভ্যন্তরীণ নালার সাহায্যে জমিতে নিয়ে পানি সেচের এক অভিনব পদ্ধতিও মুসলিম অধ্যুসিত দেশসমূহে পরিলক্ষিত হয়।

পানি উত্তোলন ও সরবরাহ পদ্ধতির উল্লেখিত ব্যবস্থা ছাড়াও উন্মুক্ত নালা বা খাল, পানি প্রবাহের জন্য তৈরি পাকা প্রণালী, পাইপ অথবা মাটির নীচে পানি যাবার সুড়ঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় প্রধান ও মাধ্যমিক পন্থাও মুসলিম দেশসমূহ অনুসরণ করে থাকে।

লেখক : সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক।

পানি বিতরণ ও পরিমাপের জন্য দেশসমূহে বহুবিধ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় :

ঝরনার পানির বেলায় ক্ষুদ্রাকার এমন ধরনের পাত্র বা আধার তৈরি করা হয় যাতে পানির পরিমাণ ও প্রবাহ সহজে পরিমাপ করা যায় এবং সরবরাহও সহজ হয়। আবার প্রবাহের হিসাব রাখার পদ্ধতি এবং বিতরণ ব্যবস্থা পানির সরবরাহ এবং স্থানীয় রীতি নীতির উপরও নির্ভর করে।

নদীর পানি বিতরণের বেলায় গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে শাখা নদী, খাল এবং নালা খনন প্রভৃতি। এগুলোর মাধ্যমে বড় বড় নদীর পানি দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফসল ও সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণ করা হয়। এই নদী এবং খালগুলো আবার পানি নিষ্কাশনের কাজেও ব্যবহৃত হয়। নদীর উপর ক্রস ড্যাম তৈরি করে পানির গতি পরিবর্তনের মাধ্যমে শুষ্ক এলাকায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা বহু পুরাতন একটি পদ্ধতি। কতিপয় প্রতিষ্ঠিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই কাজ করা হয়। উজান থেকে শুরু করে ভাটি পর্যন্ত পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের এই কাজ চলে।

ঝরনার ধরন প্রকৃতি, পানি প্রবাহের ধারাবাহিকতা, জমির অবস্থান এবং নালার গভীরতা প্রভৃতির উপর এর পানি বিতরণ নির্ভর করে। ঝরনার প্রবাহ যদি অব্যাহত ও ন্যূনতম হয় তাহলে স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী পানি বিতরণে কঠোর নিয়ম কানুন মেনে চলা হয়। সামাজিক সমঝোতার ভিত্তিতে বন্যার পানি ব্যবহৃত হয় এবং এক্ষেত্রে সকলকেই যৌথ দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজনের জমির উপর দিয়ে আরেকজনের জমিতে পানি গেলে এই পানি ব্যবহারকারী সংশ্লিষ্ট মালিকের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না, তবে পানির গতি পরিবর্তনের জন্য যদি নালা খনন বা সংস্কার করতে হয় তাহলে তা করার অধিকার তার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জমির মালিকের অনুমোদন প্রয়োজন রয়েছে। পানি সরবরাহকারী প্রধান খাল বা বাঁধ মেরামত ও সংস্কারের দায়িত্ব সকলের, ব্যবহারকারীদের সকলকেই এর ব্যয়ভার বহন করতে হয়। অবিরাম স্রোত সম্পন্ন নদীর উপর বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহের বেলায় সংশ্লিষ্ট দেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পানি বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এক্ষেত্রে মিসর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা এজন্য বাঁধের উপর এমনভাবে অনুভূমিক গোবরাট তৈরি করেছে যার মাধ্যমে পরিমাপ অনুযায়ী পানি সরবরাহ করা যায়।

উত্তোলন যন্ত্র

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে পানি উত্তোলনের জন্য বহুবিধ যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে মিসরের নীলনদ অববাহিত অঞ্চলে আর্কিমিডিশ যুগের পেঁচ কল প্রধান। যেখানে পানির স্তর নিয়মিত কিংবা তার কাছাকাছি সেখানে ছেদাওয়ালা ফাঁপা কাঠের চাকা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মিসরে পা চালিত চাকা এবং গবাদি পশু চালিত সাকিয়া বা বালতি ভিত্তিক চাকাও ব্যবহৃত হয়। সিরিয়াতে নড়িয়া নামে এক ধরনের যন্ত্র আছে যা পানি চালিত, নড়িয়ার চাকার সাথে চেপ্টা দাঁড় লাগানো থাকে। প্রবাহমান পানির চাপে এটা চলে এবং পানি উত্তোলনে সহায়তা করে। বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় দোন, হেয়ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। মিসর, সিরিয়া, সুদান, ইরান,

সউদী আরব, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো কোথাও খিতারা, কিবকাজ, খিরাজ আবার কোথাও সাদুপ নামে পরিচিত। লম্বা কাঠ বা বাঁশের খুটির এক প্রান্তে ভারী বস্তু লাগানো থাকে অপর প্রান্তে রশিতে টাঙ্গানো বালতি দিয়ে জলাশয় কূপ প্রভৃতি থেকে পানি উত্তোলন করা হয়। সাম্প্রতিক কালে এই কাজে শক্তি চালিত পাম্প এবং গভীর ও অগভীর নলকূপ ব্যবহৃত হয়।

মুসলিম বিশ্বের শুষ্ক অঞ্চলসমূহে পানি সংগ্রহের জন্য ভূগর্ভস্থ ইনফিলট্রেশান গ্যালারীর ব্যবহার সম্ভবত একটি অনন্য কৃতিত্ব। এই পানি গৃহস্থালী এবং সেচ উভয় কাজে ব্যবহার করা হয়। ইরান, লিবিয়া, মধ্যএশিয়া, ট্রান্স ককেশিয়া অঞ্চল, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, আলজেরিয়া, মরক্কো, ইরাক সিরিয়া এবং আরব উপদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলে বহু শতাব্দি ধরে নির্ধারিত দূরত্বে কূপ খনন করে সংযোগ পাইপ অথবা ক্যানেলের মাধ্যমে পানি দূর দূরান্তে নিয়ে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ইরানে ঘানাত, আজারবাইজান, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে কারেজ, ইয়েমন ও সউদী আরবে শাহজীদ, ওমানে ফালাজ এবং মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও লিবিয়ায় ফগারাক্ষ মাযান, ইফেলী, নগোলা ও খিত্তারা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে স্থাপিত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন প্রক্রিয়া কোন কোন দেশে দুই থেকে আড়াই হাজার বছর পুরাতন। মুসলমানরা একে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী Infiltration Gallery ভুক্ত কূপ সমূহের গভীরতা ১০০ থেকে ১৫০ মিটার বিস্তৃত এবং লম্বায় এগুলো ১০ কিলোমিটার থেকেও বেশি, এই পদ্ধতিতে ভূগর্ভে আনুভূমিক গ্যালারীগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যে পানির নিয়মিত স্তরে খননকৃত কূয়াগুলোতে জমা হওয়া পানি Grairty flor এর মাধ্যমে সুড়ঙ্গ পথে এক কূয়া থেকে অন্য কূয়ায় চলে যায় এবং এভাবে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে; জনসাধারণ বিভিন্ন উত্তোলক যন্ত্রের সাহায্যে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পানি সংগ্রহ করে। অবশ্য মওসুম ভেদে এবং ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত কারণে গ্যালারীসমূহের পানি ধারণ ও বর্জন ক্ষমতা উঠা নামা করে। খরা মওসুম প্রলম্বিত হলে পানির স্তর নীচে নেমে যায়। তখন গ্যালারীর পানি ডিসচার্জও কমে যায়। আবার বৃষ্টিপাত হলে রিচার্জ হয়ে পানির স্তর উপরে ওঠে এবং সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের এই পদ্ধতির অনুসরণেই বর্তমান যুগের গভীর ও অগভীর নলকূপ খনন ও ব্যবহারের সূত্রপাত হয়েছে বলে গবেষকরা মনে করেন। Infiltration Chamber পদ্ধতিকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার লক্ষে বেশির ভাগ দেশেই প্রয়োজনীয় বিধি বিধান প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হয়। এই বিধি বিধানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিধি হচ্ছে গ্যালারী খনন ও ব্যবহার বিধি। এই বিধি অনুযায়ী নতুন গ্যালারী খননের বেলায় একটি ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখতে হয় যাতে করে পুরাতন গ্যালারীতে পানির সংকট দেখা না দেয়।

অধিক গভীরতা সম্পন্ন গ্যালারী বা কূপ খনন অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি কাজ। এজন্য শুরু থেকেই মুসলিম দেশসমূহে বিত্তশালী ভূস্বামী, স্বায়ত্ত শাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন

মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান মসজিদ মাদরাসা কিংবা বিভিন্ন সমিতির তরফ থেকে এ দায়িত্ব পালন করে আসা হচ্ছে।

এখানে জমির মালিকানা এবং পানির মালিকানা সম্পূর্ণ আলাদা এবং এ প্রেক্ষিতে জমি ও পানি বিক্রি অথবা এর জন্য ভাড়া আদায়ের ব্যাপারে স্বতন্ত্র বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ওজন বা পরিমাপের ভিত্তিতে পানি বিক্রি করা হয় না; প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী মোট সরবরাহের একটা অংশ বিক্রি হয়। কাজেই সরবরাহ হ্রাসজনিত কারণে যদি পরিমাণে হেরফের হয় তাহলে বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার কোনও আক্ষেপ থাকতে পারে না। আবার অবস্থানগত কারণে পানি স্বত্বের মূল্যের ক্ষেত্রেও হেরফের হয়। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী যিনি বা যারা সুড়ঙ্গ মেরামতের কাজে সহযোগিতা করে থাকেন তাকে বা তাদের প্রবাহের ভিত্তিতে অতিরিক্ত পানি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহারের সাথে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। শুষ্ক এলাকায় এবং এমনকি শুষ্ক মওসুমে পানির এই উৎসটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। ভূউপরিস্থ পানি না থাকায় ভূগর্ভস্থ পানির উপর অতিরিক্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একমাত্র নির্ভরশীলতার কারণে মাত্রাতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর বেশি নিচে নেমে গেলে গাছ পালার উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়া ছাড়াও ভূমি ধস এবং ভূমির নিম্ন পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তে পারে যা জনবসতির জন্য মারাত্মক। এ প্রেক্ষিতে মুসলিম দেশসমূহ একদিকে জোনিং প্রথার প্রবর্তন করেছে অন্যদিকে আইন করে এক কূয়া থেকে আরেক কূয়া বা নলকূপের দূরত্ব বেঁধে দিয়েছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের আইন রয়েছে। এই আইন অনুযায়ী একটি গভীর নলকূপ থেকে আরেকটি গভীর নলকূপের দূরত্ব ২৫০০ ফুট। একটি গভীর নলকূপ থেকে আরেকটি অগভীর নলকূপের দূরত্ব ১৭০০ ফুট এবং একটি অগভীর নলকূপ থেকে আরেকটি অগভীর নলকূপের দূরত্ব ৮০০ ফুট নির্ধারণ করা হয়েছে।

পানি বন্টন

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে মুসলিম দেশসমূহে প্রচলিত পানি বন্টন পদ্ধতি উদ্ভাবনের পেছনে যে কার্যকারণ কাজ করেছে তার মধ্যে ধর্মীয় বিধিবিধান এবং ভৌগলিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও কূপ, ঝরনা, নদী বা জলাশয় ভেদে পানি বিতরণের পদ্ধতির মধ্যেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পানির পর্যাপ্ততা অথবা দুষ্প্রাপ্যতার উপর এই পদ্ধতি নির্ভরশীল। পানির সরবরাহ অঢেল হলে বিতরণে নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রশ্ন গৌন হয়ে দাঁড়ায়। আবার সরবরাহ যদি কম এবং চাহিদা বেশি হয় তাহলে ব্যবহারকারীদের প্রতি সুবিচারের স্বার্থে বিতরণ ব্যবস্থায় কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। একটি অঞ্চল বা এলাকায় কোনও বিশেষ পদ্ধতি চালু হয়ে গেলে সন্নিহিত এলাকায়ও তার প্রভাব পড়ে। এভাবে মুসলিম শাসক বা সমাজ কর্তৃক অনুসৃত পানি বন্টনের বহু পদ্ধতি অমুসলিম এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের অনুর্বর ও শুষ্ক অঞ্চলসমূহের পানি ব্যবহার ও পানি বণ্টন পদ্ধতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এর প্রথমটি হচ্ছে পরিমাণ ভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি সময় ভিত্তিক।

১. পরিমাণ ভিত্তিক পদ্ধতি (Volumetric basis)

এই পদ্ধতির অধীনে পানি পাবার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন অংশ পেয়ে থাকেন। তাদের অংশ নির্ণয়ের প্রাক্কালে প্রবাহের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং পানির উৎস মুখে স্থাপিত একটি নকশার ভিত্তিতে পানি বণ্টনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। অঞ্চল ভেদে নকশার ধরন প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। পানির হিস্সা অনুযায়ী ছিদ্র বিশিষ্ট কাঠের তক্তা, ধাতুর তৈরি দণ্ড বা পাইপ অথবা মাটির বাঁধকে পানির উৎসে স্থাপন করে সুবিধাভোগীদের পানি প্রদান করা হয়ে থাকে। কাঠের তক্তা হলে যে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় তার সাইজ বা আকার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার যদি এটা বাঁধ হয় তাহলে পানি চলাচলের জন্য তার উপর তৈরি নালার আকার ও পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরোক্ত পদ্ধতিতে পানি বিতরণের পূর্বে সরবরাহকৃত পানির মোট পরিমাণ নির্ণয় করে পরিমাপের একটা এককের ব্যাপারে স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (X লিটার পূরণ X সময়)। পরিমাপের এই একক বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

২. সময় ভিত্তিক পদ্ধতি

এই পদ্ধতির অধীনে নলকূপ, খাল, ঝরনা বা সংরক্ষিত পানি নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রাপ্তি অনুযায়ী বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রেও বিতরণের পূর্বে মোট পানির পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং অংশীদারদের মধ্যে তা ভাগ করে বিতরণ যন্ত্রের ভিত্তিতে প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে সময়ের এককের সাথে সমন্বয় করা হয়। এখানে অংশীদারদের সংখ্যা এবং পানির পরিমাণ মুখ্য বিষয়। বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহৃত হয়। এই নলকূপ এবং পাম্পগুলোর নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি থাকে। কোনটির ক্ষমতা আধা কিউসেক, কোনটির এক কিউসেক, আবার কোনটি দুই কিউসেক বা তার বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন। এই ক্ষমতা ঘনফুটের আকারে প্রতি সেকেন্ডে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসমূহের পানি উত্তোলন ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। আমাদের সেচ যন্ত্রসমূহকে কেন্দ্র করে দেশের সর্বত্র কৃষকরা সমবায় সমিতি অথবা ওয়াটার ইউজার্স এসোসিয়েশন গড়ে তুলছে। অনেক স্থানে এই যন্ত্রগুলো সমিতির মালিকানায় পরিচালিত হয়। যে সমিতির মালিকানা নেই সেখানে এগুলো স্থানীয় প্রভাবশালী, কৃষক অথবা ব্যবসায়ীরা পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রেও অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারকারীরা গ্রুপ বা দল গঠন করেন। তবে উভয় ক্ষেত্রেই দল বা সমিতির সদস্যরা জমির অনুপাতে পানি পান। কৃষকরা তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অথবা কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের ফসলের পানি চাহিদা সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং তার ভিত্তিতে বিতরণ কর্তৃপক্ষ কার কি পরিমাণ পানি প্রয়োজন হবে পূর্বাহ্নে তা

নিরূপন করে ঘণ্টার ভিত্তিতে পানি বিতরণ করেন। ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য এখানে যন্ত্র ভিত্তিক চকবন্দী নির্ণয় করে তাকে ছয় ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক দিন এক এক ভাগে পানি দেয়া হয়। এই পানি-নালার মাধ্যমে হিসসা অনুযায়ী কৃষকদের জমিতে চলে যায়। একদিন মেরামত সংরক্ষণ কিংবা রেস্টের জন্য মেশিন বন্ধ থাকে। আধুনিক এই পদ্ধতিটি মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে একটি উত্তরাধিকার বলে গবেষকরা মনে করেন।

বলা বাহুল্য ঘড়ি আবিষ্কার বা তার ব্যাপক ব্যবহারের পূর্বে মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সময় গণনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, সূর্যের তাপের তীব্রতা মানুষ কিংবা গাছের ছায়ার অবস্থান প্রকৃতি প্রভৃতিকে ভিত্তি করে দিনের বেলা এবং আকাশে তারার অবস্থান এবং চাঁদের আলোর ছায়া অথবা তিথির ভিত্তিতে চন্দ্রোদয় ও অস্ত গমন প্রভৃতি বিবেচনা করে রাতের বেলা সময় পরিমাপ করার নিয়ম তখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে কারোর প্রতি যাতে অবিচার না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সময়কে সমম্বয় করা হতো, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে দিবা রাত্রি উভয় সময়ের সরবরাহ গ্রহণ করতে হতো। এতে দিনের মেয়াদ এবং রাতের মেয়াদের তফাৎজনিত কারণে সরবরাহের ক্ষেত্রে যে ব্যবধান হতো তা মিটে যেতো। বন্যা, খরা এবং আবহাওয়াজনিত পরিবর্তনের ফলে সরবরাহে সৃষ্ট হেরফেরের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও মুসলমানদের তৈরি পানি আইনে ছিল।

ব্যবস্থাপনা ও তদারকী কাজ

মালিকানার প্রকৃতির উপর পানি বিতরণ ব্যবস্থার তদারকী সাধারণত নির্ভরশীল। কূয়া, ঝরনা, দীঘি অথবা খালের মালিকানা ব্যক্তি ভিত্তিক হলে সংশ্লিষ্ট মালিক বা মালিকরাই এর পরিকল্পনা, সংগঠন, দিক নির্দেশনা, তদারক এবং মেরামত সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন এবং এ উদ্দেশ্যে জনবল নিয়োগ দেয়া তাদেরই দায়িত্ব। অন্যদিকে সরকারি বা সামাজিক মালিকানার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা সরকারের। মধ্যযুগে এবং এখনো বিভিন্ন মুসলিম দেশে এসব কর্মচারীরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোথাও এরা আমীন, কোথাও কিয়াল আল মা, রইস, সাওইস, মীর আব অথবা মীর আন নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। একাধিক কর্মকর্তা থাকলে তাদের মধ্যে একজন প্রধান থাকেন এবং তিনিই মুখ্যত পানি বিতরণের সিদ্ধান্তের মালিক।

এখনো অনেক অঞ্চল আছে যেখানে পানিদার বা পানির মালিকরা অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। তাদের কর্তৃত্ব অবিসংবাদিত এবং তারা ম্যাজিস্ট্রেটদের সমতূল্য দায়িত্ব পালন করেন। পানি চুরি অথবা মূল্য পরিশোধে বিলম্ব কিংবা বিতরণ সংশ্লিষ্ট অন্য কোনও অপরাধের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী তারা আদালতের ন্যায় রায় প্রদান করতে পারেন। এটা অনেকটা সরকার অনুমোদিত সালিস বা পঞ্চায়েত কমিটির মতো।

পানির ব্যবহারিক স্বত্বের অনুপাতে প্রদত্ত রাজস্বের মাধ্যমে যে তহবিল সৃষ্টি হয় তা থেকেই পানি বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

মুসলিম আইন জলাধারের সংরক্ষণের উপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। একে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাকে যেমন সামাজিক দায়িত্ব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তেমনি জলাধারের মালিকদের উপরও এর প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, শরিয়া অনুযায়ী জলাধারে অথবা তার সন্নিহিত স্থানে পায়খানা পেশাব করা অত্যন্ত গর্হিত একটি কাজ যা থেকে বিরত থাকার জন্য মুমিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার মালিকের অনুমতি ব্যতীত তৃষ্ণা নিবারণ ছাড়া অন্য কোন কাজে কোনও কূয়া দীঘি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন জলাশয় থেকে পানি তোলাও ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পানি সংক্রান্ত যে কোনও বিরোধ মিটানোর জন্য এই আইনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করেছে।

প্রমাণপঞ্জি

1. Muktari AMA hand Tense and water Rights, A request prepared by Sir Willium Halcrow and Partners on Irrigation Development in the Wadi J.-Zam, July, 1972.
2. Shaikh-al-Islam Ibn Taimiyyah, Al Siyasah al shariyah, ed. Mubarak, Beirut, 1966.
3. Water Laws in Muslim Countries, FAO, vol. i & ii.
4. Ahmed Assah, Miracle of the desert Kingdom, London, 1969.
5. Government of Bangladesh, Ground water Ordinance 1986.

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ৬৩-৮০

গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনা, প্রচলিত আইন ও বাস্তবতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

নাহিদ ফেরদৌসী

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নয়ন অনেকাংশে শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে ৭৫% এর অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টস শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক এ খাতে কর্মরত, যাদের ৭০ শতাংশই নারী। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে নারীদের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনে অনুকূল প্রভাব ফেলছে। সেদিক থেকে সামাজিক উন্নয়নেও এ খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে কর্মপোযোগী পরিবেশ, স্বাস্থ্য সেবা ও নিরাপত্তার দিকটি রয়েছে যথেষ্ট অবহেলিত। যার ফলে লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। অথচ কর্মপোযোগী পরিবেশ এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা শ্রমিকদের একটি মৌলিক অধিকার। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন থেকে জাতীয় আইনে, বিশেষত ইসলামী আইনেও শ্রমিকদের অধিকার যথাযথভাবে সুরক্ষিত। বাংলাদেশের শ্রম আইনে শ্রমিকদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা ধরনের আইন থাকা সত্ত্বেও গার্মেন্টস শিল্পে প্রায়ই মারাত্মক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সংঘটিত হয়েছে। ফলে অসংখ্য নিরীহ শ্রমিকের মৃত্যু হচ্ছে। শ্রমিক এবং মালিকের ক্ষতির পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশের ভাবমর্যাদাও নষ্ট হচ্ছে। এ ধরণের দুর্ঘটনার ফলে এ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তার প্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতিতেও পড়ছে।

অথচ শিল্পায়নের সূচনা এবং শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়নের প্রচেষ্টার ফলেই আধুনিক শ্রম আইনের জন্ম। কিন্তু শ্রমিকদের জীবনযাত্রা শতাব্দীকাল আগে যে পর্যায়ে ছিল আজও প্রায় সেখানেই রয়ে গেছে।[১] দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, উপনিবেশ শাসনামল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে শ্রম ও শিল্প আইন বিভিন্নভাবে উপেক্ষিত। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক এবং শিল্পের দুরবস্থার মূলে শ্রম ও শিল্প আইনের ভুল ভ্রান্তি ও অসংলগ্নতাই বহুলাংশে দায়ী।

বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রম আইনের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে বৃটিশ আমলের ১৫টি, পাকিস্তান আমলের ২৩টি এবং অবশিষ্ট ১২টি বর্তমান বাংলাদেশ আমলে প্রণীত হয়েছে। শ্রমিকদের

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধসহ অন্যান্য বিষয় এই সকল আইনে বিধিবদ্ধ থাকলেও তা উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে পশ্চাৎপদ ও অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাই ২০০৬ সালের ১১ই অক্টোবর ৫০টি শ্রম আইনের সমন্বয়ে যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' পাস করা হয়। একই সাথে উক্ত আইনের ৩৫৩ ধারানুযায়ী পূর্ববর্তী ২৭টি শ্রম আইন বাতিল করা হয়।[২]

বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্য ব্যবস্থা শুরু হয়েছে যা বাংলাদেশেও চালু আছে। তবে এক্ষেত্রে এদেশে যৌথ ব্যবস্থাপনার যে কার্যক্রমগুলো আছে তাতে বিদেশী সংস্থা সমূহ এদেশে কাজ করলেও তারা দেশীয় আইন মেনে চলতে চায় না এবং কখনও কখনও দেশীয় আইনের অপব্যবহার হয়। অথচ শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন নির্ভর করে আইনের প্রতি উভয়পক্ষের শ্রদ্ধাবোধ এবং যথাযথভাবে নিয়ম ও বিধি বিধান অনুশীলনের উপর। তাই শ্রমও শিল্প আইন শুধুমাত্র শিল্পের সাথে সম্পর্কিত মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর উন্নয়নেই ভূমিকা রাখে না সামগ্রিকভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও নিশ্চিত করে। কিন্তু আমাদের দেশে আইন বলবৎ করার প্রক্রিয়ার অভাব এবং কিছু মালিক পক্ষের সদিচ্ছার অভাবের কারণে গার্মেন্টস কারখানার নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও সমাধানহীন রয়ে গেছে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না হলে আগামী দিনে এই ধরনের দুর্ঘটনার ফলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নের সম্মখীন হতে হবে এবং বিদেশী ক্রেতাদের হারাতে হবে। তাই ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। মালিক পক্ষকে আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং তাদের বিল্ডিং ও কাঠামোগত ত্রুটির বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যা দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করবে। শ্রমিকদের জীবনের নিশ্চয়তার পাশাপাশি কোটি কোটি টাকার মালামালও রক্ষা পাবে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ শিল্প আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন অনেকাংশে পুরনো শ্রম আইনের একটি নতুন রূপমাত্র। দেশে শ্রম আইন থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ গার্মেন্টস কারখানায় সুষ্ঠু নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার কারণে প্রায়ই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। প্রতি বছর গার্মেন্টস কারখানাতে আগুন অথবা আগুনের আতঙ্কে পদপিষ্ট হয়ে বহু নারী ও পুরুষ শ্রমিক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকাকালে প্রাণ হারাচ্ছে। এ যাবত গার্মেন্টস কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার মধ্যে ৩০/০১/২00৫ সালে স্পেকট্রাম সুয়েটার কারখানার দুর্ঘটনাটি শুধুমাত্র ভবন ধসে হয়েছিল। এছাড়া বাকি সব দুর্ঘটনা বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট ও অগ্নিকাণ্ড থেকে সংঘটিত।

বিজিএমইএ কর্তৃক সম্পাদিত অগ্নি দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯০ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট অগ্নি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় ১৩৩টি কারখানায়। ১৩৩টি কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা হলেও ১৯টি কারখানায় ২২২ জন শ্রমিক নিহত হয়, বাকী কারখানাগুলোর শ্রমিক নিহত

হয়নি শুধু আহত হয় এবং কারখানার কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৩৩টি কারখানায় আহত হয় মোট ৪৭৪ জন শ্রমিক।

সারনী-১

গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে অগ্নি দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য

সাল	কারখানার সংখ্যা	নিহত শ্রমিকের সংখ্যা
১৯৯০	০১টি	২৩ জন
১৯৯৫	০৩টি	১৪ জন
১৯৯৬	০১টি	১৪ জন
১৯৯৭	০৬টি	৪১ জন
১৯৯৮	০৪টি	০১ জন
১৯৯৯	১৬টি	০২ জন
২০০০	১৯টি	১২ জন
২০০১	২৩টি	২১ জন
২০০২	০৯টি	০০ জন
২০০৩	১৫টি	০০ জন
২০০৪	১৬টি	০৭ জন
২০০৫	০৯টি	২২ জন
২০০৬ সেপ্টে: পর্যন্ত	১১টি	৬৭ জন

নোট : ২৩/০২/২০০৬ সালে চট্টগ্রামে কে টি এস গার্মেন্টস-এ ৬৫ জন শ্রমিক এবং ০৬/০৩/২০০৬ সালে গাজীপুরে সায়েম গার্মেন্টসে ০২ জন শ্রমিক নিহত হয়। ১৯৯০ সালের পর থেকে ১৯৯৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন তথ্য বিজিএমইএ-কর্তৃক সংরক্ষিত নেই।

উৎস : বিজিএমইএ-এর ফায়ার সেফটি সেল থেকে সংগৃহীত তথ্য, সেপ্টেম্বর ২০০৬।

এ যাবত গার্মেন্টিস কারখানায় দুর্ঘটনার নেপথ্যে সাধারণত যে সব কারণ দেখা যায় তা হল :

* কারখানায় সংকেতের মাধ্যমে সতর্কীকরণ ব্যবস্থার অভাব বা শ্রমিকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ না থাকা।

* কারখানায় পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের অভাব বা অপ্রতুলতা।

* শ্রমিকদের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ না থাকা।

* কারখানায় বিকল্প সিঁড়ি বা জরুরী নির্গমণ পথ না থাকা অথবা বিকল্প সিঁড়ি থাকলেও তা ব্যবহার উপযোগী না হওয়া।

* কারখানার প্রতিটি সিঁড়িতে বিকল্প বাতির ব্যবস্থা না থাকা।
* কারখানায় ত্রুটিপূর্ণ বিদ্যুৎ/গ্যাস লাইন ও ফিটিংসসমূহ।
* কারখানার ফ্লোরকে মালামাল রাখার স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা।
* সিঁড়ির হ্যান্ডরোল না থাকা এবং সিঁড়ি বা যাতায়াত পথে মালামাল রাখার ফলে স্বাভাবিক যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি।
* কলাপসিবল গেইট বন্ধ রাখা।
* আপদকালীন সময়ে কারখানা থেকে বের হওয়ার বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ না থাকা।

অগ্নি দুর্ঘটনা কবলিত কয়েকটি গার্মেন্টস কারখানার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

কেস স্টাডি-১ :

কে, টি, এস, গার্মেন্টস, আরিনা গ্রুপ, কালুর ঘাট, চট্টগ্রাম।

কে, টি, এস, কারখানায় ১২০০ শ্রমিক ২ শিফটে কাজ করতেন। ২৩/০২/২০০৬ তারিখ সন্ধ্যায় যখন অগ্নি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তখন প্রায় ৬০০ জন শ্রমিক ভবনের ভিতর কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগ শ্রমিক মহিলা ও শিশু। যখন অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে তখন দুটো কলাপসিবল গেইটের মধ্যে একটি গেইট বন্ধ ছিল। ফলে ৬৫ জন শ্রমিক জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় এবং ১৫০ জন গুরুতর আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ৩৫ জন শ্রমিক এমনভাবে অগ্নিদগ্ধ হয় যে, তাদের পরিচয় সনাক্ত করা যায়নি। আঘাত প্রাপ্ত শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, বয়লার বিষ্ফোরণ হয়ে যখন পুরো বিল্ডিংয়ে আগুন ছড়িয়ে পরে তখন শ্রমিকরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে কিন্তু ফ্লোরের দুটো গেইটের মধ্যে একটি গেইট বন্ধ থাকায় তারা দ্বিতীয় তলার জানালা ভেঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য ঝাঁপ দেয়। বেশির ভাগ মহিলা শ্রমিকরা জানালা দিয়ে বের হতে না পারায় জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

কেস স্টাডি -২ :

স্পেকট্রাম সুয়েটার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, পলাশবাড়ী, সাভার।

১১/৪/২০০৫ সালে সাভারের স্পেকট্রাম সুয়েটার কারখানাতে কোন অগ্নি দুর্ঘটনা হয়নি। ৯ তলা ভবন ধসে ৭০ জনের বেশি গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত এবং আহত হয়েছিল ৪০০ জনের বেশি। বেশিরভাগ আহত শ্রমিকদের কারও হাত, পা এবং স্পাইনাল কর্ড এ ক্ষতি হয়েছিল যা তাদের পরবর্তীতে পঙ্গু করে দিয়েছে। এখনও আহত অনেক শ্রমিক দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসায় আছে। স্পেকট্রাম সুয়েটার কারখানায় কাজ করতো জাহাঙ্গীর আলম এবং নূরুল আলম ,তারা দুই জন ২০০৬ সালের ৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শ্রমিকদের দুর্ঘটনা বিষয়ক সচেতনতার বিষয়ে ইউরোপে সংবাদ সম্মলনে যোগ দেয় । সেখানে তাদের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা বর্ণনা করে বলে, দুর্ঘটনার পর শতাধিক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে, আহত শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার দায়িত্ব কয়েকটি শ্রমিক ফেডারেশন পালন করলেও কর্তৃপক্ষ এ দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। এমনকি দুর্ঘটনার ৬ মাস পরেও শ্রমিকরা তাদের ওভার টাইমের টাকা ও ক্ষতিপূরণ পায়নি বলে তারা জানায় ।

কেস স্টাডি-৩ :

সায়েম ফ্যাশন, বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

০৬/০৩/২০০৬ তারিখে সায়েম ফ্যাশনে আগুনের আতংকে ৩জন শ্রমিক পদপিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক ভাবে মারা যায়।

গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনার পরবর্তীকালে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তায় গৃহীত কিছু পদক্ষেপ ও বাস্তবতা

দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য যথাযথ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকার বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত দরিদ্র শ্রমিকরা জীবন ধারণের সামান্য রুজির জন্য কারখানায় গিয়ে জীবন হারায়, তাদের জন্য মালিকপক্ষ ও সরকারের অর্থবহ ভূমিকা নেয়া জরুরী। তাই কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকার, বিজিএমইএ এবং মালিক ও শ্রমিকদের সমন্বিত ভূমিকার বিকল্প নেই। সরকার ও মালিক পক্ষ গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের নিরাপদে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

বিজিএমই -এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে ৬টি কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনায় ৪১ জন শ্রমিক নিহত এবং অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়। ১৫/০৭/১৯৯৭ সালে মিরপুরের মাজার রোডে একসাথে তামান্না, রাব্বানী, ম্যাক্সবর্ণ ও রহমান এন্ড রহমান- এই চারটি গার্মেন্টস কারখানায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে এবং অগ্নিকাণ্ডের ভয়ে একসাথে বের হতে গিয়ে ধাক্কা ধাক্কিতে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে বহু শ্রমিক প্রাণ হারায়। এরপর গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও বিভিন্ন দুর্ঘটনা রোধকল্পে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই প্রণীত কার্যক্রমে অগ্নি প্রতিরোধে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী অনুসন্ধান ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে প্রত্যেক গার্মেন্টস কারখানায় ওয়েলফেয়ার অফিসার, ফায়ার অফিসার এবং লেবার অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি মনিটরিং -এর কাজ করছে।[৩]

Bangladesh Garments Manufactures and Exporters Association (BGMEA)-এর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

BGMEA একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক এসোসিয়েশন যা মালিকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি শ্রমিকদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। গার্মেন্টস কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশেষ করে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের আস্থা সৃষ্টির জন্য বিজিএমইএ ২০০১ সালে Crash Program on Fire Prevention & Safe Exit শুরু করে। তিন মাস মেয়াদের এই Crash Program- এর মাধ্যমে বিজিএমইএ

কর্মক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার এবং আপদকালীন সময়ে কারখানা হতে বের হওয়ার বিষয়ে ঢাকা, গাজীপুর, সাভার ও নারায়নগঞ্জে বহু ট্রেনিং ও সেমিনারের আয়োজন করেছে। ফলে দেখা যায়, ২০০১ সালের পর বিভিন্ন কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলেও পদপিষ্ট হয়ে কোন শ্রমিক নিহত হয়নি। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজিএমইএ ঢাকা এবং চট্টগ্রামে ২০০৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত তিন মাস ব্যাপী Crash Program কার্যক্রম চালায়।[৪] এছাড়া ২০০৬ সালে দু দফায় বিজিএমইএ বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নি ও অন্যান্য দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ প্রচার কার্যক্রম চালিয়েছে।

২০০৬ এর Crash Program- এর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে দেয়া হলো :

'Report of crash program' on Fire & Safety measures in RMG Units-2006

সারণি-২

Crash Program-এর সাফল্য (১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে, ২০০৬)

বর্ণনা	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সর্বমোট
সর্বমোট পরিদর্শনকৃত কারখানার সংখ্যা	১,৯২৩	৪৬২	২,৩৮৫
অগ্নিসংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে	১,১৪৪	৪২২	১,৫৬৬

গার্মেন্টস কারখানায় দুর্ঘটনা পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। প্রতি বছর নীট ও ওভেন সামগ্রী রফতানির মাধ্যমে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। দেশের রফতানি আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে গার্মেন্টস কারখানা থেকে। বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্প একটি প্রতিযোগিতামূলক সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্ববাজারে ফিনিশ্‌ড সামগ্রীর আকস্মিক মূল্য পতন সত্ত্বেও বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পখাত এখনও কৃতিত্বের চিহ্ন এঁকে যাচ্ছে। ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী রফতানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১০.৫৩ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে তৈরী পোশাক খাতে ওভেন এবং নিটের রফতানি বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৩.৫ ও ৩৫.৪ শতাংশ। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে গার্মেন্টস কারখানা শিল্প অগ্নি দুর্ঘটনায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গার্মেন্টস কারখানায় দুর্ঘটনা পরবর্তী নিম্নলিখিত যে সকল ক্ষতি প্রকটভাবে দেখা যায় :

* দুর্ঘটনা কবলিত কারখানার মেশিন ও যন্ত্রাংশ সমূহ নষ্ট হয়।

* ক্ষতিগ্রস্ত কারখানায় কাজ বন্ধ থাকে বিধায় শ্রমিকরা কাজের খোঁজে অন্য কারখানায় চলে যায়।

* কারখানায় মজুদকৃত কাঁচামালের ক্ষতি হয়।

* কখনও কখনও কারখানা ভবনের ক্ষতি হয়।

* দুর্ঘটনার ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি সঠিক সময়ে বায়ারদের অর্ডার ডেলিভারী দিতে না পারা। অনেক সময় পরবর্তী অর্ডারও বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে পূর্বের ও বর্তমান শ্রম আইন সমূহ

জাতীয় আইন সমূহ :

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন পাসের পূর্বের আইনসমূহ : কারখানার শ্রমিকদের কাজের সুবিধা, নিরাপত্তা, উন্নততর কাজের পরিবেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের বিধান থাকলেও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত প্রধানত ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন এবং ১৯৭৯ সালের কারখানা বিধিমালাসমূহ কার্যকর ছিল।

কারখানা আইন, ১৯৬৫ (Factories Act 1965)

১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে ৩, ৪ ও ৫ অধ্যায়ে ১২ ধারা থেকে ৪৮ ধারা পর্যন্ত বিধানাবলীতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি অতি গুরুত্বসহকারে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছিল। বিশেষ করে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে ২২ ধারা থেকে ৪২ ধারা পর্যন্ত ২০টি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল।

কারখানার নিরাপত্তা ও কাজের উন্নত পরিবেশ এবং দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ বিষয়ে ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের পাশাপাশি ১৯৭৯ সালে কারখানা বিধিমালা প্রণীত হয়।[৫]

কারখানা বিধিমালা, ১৯৭৯ (Factories Rules 1979)

কারখানা আইনের বিধিমালায় ৩৭ বিধি থেকে ৫৩ বিধি পর্যন্ত নিরাপত্তামূলক বিধান সন্নিবেশিত ছিল।[৬] এছাড়া শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে নিম্নের আইনসমূহ প্রচলিত ছিল :

মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন, ১৮৫৫ (The Fatal Accident Act 1855)

মালিকের দায়-দায়িত্ব আইন, ১৯৩৮ (The Employers Liability Act 1938)

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩ (The Workmen's Compensation Act 1923)

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিধিমালা ১৯২৪ (The Workmen's Compensation Rules 1924)

ফায়ার সার্ভিস অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (The Fire Services Ordinance 1959)

কিন্তু বাস্তবে এইসব আইন তেমন একটা কার্যকর বা সহায়ক ছিল না। এ সকল আইনের কোনোটিতেই একজন মৃত শ্রমিকের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিধান ছিল না।[৭]

বর্তমান শ্রম আইন : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (Bangladesh Labour Law 2006)

দেশে প্রচলিত সকল শ্রম আইন পর্যালোচনা পূর্বক এক যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়নের লক্ষে ১৯৯২ সালে গঠিত 'শ্রম আইন কমিশন' ৪৪টি শ্রম আইন পর্যালোচনা করে ২৭টি শ্রম সম্পর্কিত আইন রহিতকরণ সাপেক্ষে 'খসড়া লেবার কোড ১৯৯৪' সরকারের কাছে দাখিল করে। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে 'শ্রম আইন পুনর্বিন্যাস কমিটি' গঠন করে ৩৯টি সংশোধনী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করে 'খসড়া শ্রম আইন ২০০১' তৈরি করা হয়। শ্রমিক নিয়োগ, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, মজুরি পরিশোধ, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্পবিরোধ উত্থাপন ও নিস্পত্তি, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও চাকরির অবস্থা ও পরিবেশ এবং শিক্ষাধীনতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সকল আইনের সংশোধন করে একটি আইন করার জন্য এই খসড়া আইন তৈরি করা হয়।[৮]

অবশেষে ২০০৬ সালের ১১ই অক্টোবরে ২৭টি পৃথক আইনকে সমন্বয় করে সরকার 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' পাস করেন। এই শ্রম আইনে শ্রমিকের চাকুরির শর্ত, শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগ ও শিক্ষানবিশ কাল, নিয়োগপত্র, সার্ভিস বই, ছুটির পদ্ধতি, কাজ বন্ধ রাখা, প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, মৃত্যুজনিত সুবিধা, শাস্তি পদ্ধতি, নিম্নতম মজুরী বোর্ড সহ ৩৫৪টি ধারা বিধিবদ্ধ হয়েছে। মোট ২১ টি অধ্যায়ে এই ধারাগুলোকে সংযোজন করা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নতি সহজ হবে। কারখানায় দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে।

কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বিধানসমূহ :

বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে স্থান পেয়েছে। এই আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৬১ ধারা থেকে ৭৮ ধারা পর্যন্ত কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক বিধানসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসকল বিধান পূর্ববর্তী শ্রম আইন অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের ২২ ধারা থেকে ৪২ ধারা এবং ১৯৭৯ সালের কারখানা বিধিমালার ৩৭ বিধি থেকে ৫৩ বিধিসমূহের সমন্বয়ে বিধিবদ্ধ হয়েছে। নিরাপত্তামূলক এসব বিধান কারখানা কর্তৃপক্ষের অবশ্য পালনীয়। এর কোন বিধান ভঙ্গ করা হলে বা পালন করা না হলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

ধারা ৬২ : অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন (Precaution incase of fire)

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি ধারা নির্ধারিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রত্যেক তলার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী অন্তত একটি বিকল্প সিঁড়িসহ বহির্গমনের উপায় এবং অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. যদি কারখানা পরিদর্শক প্রত্যক্ষ করেন যে, কোন কারখানায় ১ উপ ধারা অনুযায়ী কার্যকর বহির্গমনের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা হয়নি সেক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পন্থায় উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানার ম্যানেজারকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

৩. নিরাপত্তামূলক বিধানানুযায়ী প্রতিটি কারখানার কোনো ঘর থেকে বের হওয়ার দরজা তালাবদ্ধ বা শক্ত করে আটকানো যাবে না, যাতে করে কোনো ঘরের মধ্যে কোন লোক থাকা পর্যন্ত দরজা যেন সহজে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে খোলা যায়। এসব দরজা স্লাইডিং ধরনের না হলে প্রত্যেক দরজা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বাইরের দিকে খোলা যায় এবং দুটি কামরার মধ্যবর্তী স্থানে হলে সে দরজা কাছাকাছি বের হওয়ার রাস্তার নিকটবর্তী জায়গা তৈরি করতে হবে এবং ঘরের কোনো দরজা ভিতরে কাজ চলার সময় তালাবদ্ধ করে রাখা যাবে না বা কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারবে না।

৪. প্রত্যেক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের সময় শ্রমিক সহজে বের হতে পারে এমন সকল জানালা-দরজা বা অন্য কোনো বর্হিগমন পথে অধিকাংশ শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় লাল কালিতে বড়ো আকারে লিখিত নিশানা বা অন্য কোনো বোধগম্য সঙ্কেত টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।

৫. প্রত্যেক কারখানায় নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমিকের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে কার্যকর এবং সহজে গ্রহণযোগ্য উপায়ে হুশিঁয়ারি সঙ্কেত দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. অগ্নিকাণ্ডের সময় গৃহীত উপায়সমূহ প্রত্যেক ঘরের শ্রমিকগণ যাতে ব্যবহার করতে পারেন সেজন্য একটি উপযুক্ত বর্হিগমনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭. যেসব কারখানায় নীচতলা ছাড়া অন্য কোন তলায় সাধারণত ১০ বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করেন অথবা যেখানে বিস্ফোরক বা সহজ-দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত বা জমা করে রাখা হয় তার প্রত্যেকটিতে আগুন লাগলে আত্মরক্ষা বা পালানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করতে হবে বা অনুরূপ দুর্ঘটনার সময় আত্মরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মিত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. পঞ্চাশ বা ততোধিক শ্রমিক/কর্মচারী সম্বলিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর অন্তত একবার অগ্নিনির্বাপন মহড়ার আয়োজন করতে হবে, এবং এই বিষয়ে মালিক কর্তৃক র্নিধারিত পন্থায় একটি রেকর্ডবুক সংরক্ষণ করতে হবে।

এছাড়া এই আইনে বিপদজনক যন্ত্রে নিয়োগ এবং বিপদজনক গ্যাস, বিষ্ফোরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক বিধান উল্লেখ আছে।

ধারা ৭৭ : বিপদজনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Precautions against dangerous fumes)

কোন কারখানার যে সকল ঘর, চৌবাচ্চা, জলাধার, পাইপ, গর্ত বা অনুরূপ কোন স্থান হতে বিপদজনক ধোঁয়া নির্গত হয় সেখানে সুড়ঙ্গ পথ বা অনুরূপ কোন পথে তা নির্গমনের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে অথবা উপযুক্ত ম্যানহোল সংযোজিত না থাকলে সেখানে কোন শ্রমিককে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কারখানার অধিকাংশ শ্রমিককে উক্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ধারা ৭৮ : বিস্ফোরক ও দাহ্য ধুলা গ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান (Explosive or inflammable dust, gas, etc.)

কোন কারখানায় বিশেষ ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়ার কারণে যদি এমন ধরনের ধুলা বা গ্যাসের সৃষ্টি হয় যাতে আগুনের স্পর্শে সহজেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে সেক্ষেত্রে তা পরিহারের জন্য নিম্নোক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

১. উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত সকল যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ কার্যকরভাবে ঘেরা দিতে হবে;

২. উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে উৎক্ষিপ্ত ধুলা, গ্যাস ও ধোঁয়া অপসারণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে;

৩. আগুনের স্পর্শে যাতে না আসতে পারে সেজন্য যাবতীয় উপায় বন্ধ ও প্রয়োজনীয় ঘেরা দিতে হবে।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধানসমূহ :

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক হলো, এই আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে অতিরিক্ত একটি বিশেষ বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই আইনের সপ্তম অধ্যায়ে ৭৯ ধারা থেকে ৮৭ ধারা পর্যন্ত এসব বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। এসকল বিধানে বিপজ্জনক চালনা, দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান, দুর্ঘটনা বা ব্যাধি সম্পর্কে তদন্ত, কতিপয় বিপদের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের ক্ষমতা, বিপদজ্জনক ভবন এবং যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ধারা ৭৯ : বিপজ্জনক চালনা (Dangerous operations)

যে ক্ষেত্রে সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কোন ব্যক্তির মারাত্মক শারীরিক জখম বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে সরকার বিধি দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখিত বিধান প্রণয়ন করতে পারবে, যথা-

ক. কোন কোন পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ তা ঘোষণা করা;

খ. মহিলা কিশোর ও শিশুদের উক্ত কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা;

গ. উক্ত কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং যারা উপযুক্ত বলে প্রত্যায়িত হয়নি এরকম ব্যক্তির নিয়োগ নিষিদ্ধ করা;

ঘ. উক্ত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বা আশেপাশে কর্মরত ব্যক্তিগণের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কর্মপরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ কোন বস্তু বা পন্থা ব্যবহার করা ;

ঙ. ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে নোটিশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা।

ধারা ৮০ : দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান (Notice to be given of accidents)

কোন কারখানায় বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, গৃহ ধসে যাওয়া বা যন্ত্রপাতিতে গুরুতর দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে এবং তাতে কেউ ব্যক্তিগতভাবে আহত হোক বা না হোক, কারখানার ব্যবস্থাপক এ ধরনের দুর্ঘটনার সংবাদ পরবর্তী দুই কর্মদিবসের মধ্যে তৎ সম্পর্কে নোটিশ মারফত অবহিত করবেন।

দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনের দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৫০ ধারা থেকে ১৭৪ ধারা পর্যন্ত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ বিষয়ে বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে। ১৯২৩ সনের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের ৩ ধারা থেকে ১৭ ধারা, ১৯ ধারা, ২১ ও ২২ ধারা এবং ২৮ ধারা থেকে ৩০ ধারাসমূহ এই শ্রম আইনের এ অধ্যায়ে সমন্বয় করা হয়েছে।

ধারা ১৫৮ : মারাত্মক দুর্ঘটনা সম্পর্কে মালিকের নিকট হতে বিবৃতি তলবের ক্ষমতা (Power to requre from employers statements regurding fatal accidets)

যে ক্ষেত্রে যদি কোন শ্রম আদালত কোন সূত্র হতে এ খবর পায় যে কোন শ্রমিক তার চাকরি চলাকালে উদ্ভূত কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে সেক্ষেত্রে আদালত রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের মালিককে নোটিশ জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে আদালতের নিকট একটি বিবৃতি পেশ করার জন্য নির্দেশ দিবে, যাতে শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ ও তৎসম্পর্কিত পরিস্থিতি এবং মালিকের মতে উক্ত মৃত্যুর কারণে তিনি কোন ক্ষতিপূরণ জমা দিতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে।

ধারা ১৫৯ : মারাত্মক দুর্ঘটনার রেকর্ড (Reports of fatal accidents)

মালিক অথবা তার পক্ষে দুর্ঘটনায় মৃত্যু সম্পর্কে মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুর কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা করে শ্রম আদালতে একটি রিপোর্ট পেশ করবেন।[৯]

আন্তর্জাতিক আইনসমূহ :

আন্তর্জাতিক আইনে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বলতে শ্রমিকদের কেবল স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনাজনিত নিরাপত্তাকেই বুঝায় না বরং ব্যক্তিনিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তাকেও বুঝায়।

১৯৪৮ সনের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন ধারায় মানুষের নিরাপত্তার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-

ধারা ৩ : প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। শ্রমিকের অধিকার মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ২৩ অনুচ্ছেদে শ্রমিকের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ধারা ২৩ :

ক. প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকরি নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে মুক্ত হবার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

গ. প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সে সংগে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য সংযোজিত ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার রয়েছে।

ঘ. প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা : (আই,এল,ও,) (International Labour Organizations, ILO) আই,এল,ও, এর সদস্য হতে হলে প্রত্যেকটি দেশকে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে অন্তত দু'টি কনভেনশন অবশ্যই অনুমোদন করতে হবে তা হলো কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮।

আই,এল,ও, কনভেনশন ৮৭ : সংগঠন করার অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার।

আই,এল,ও, কনভেনশন ৯৮ : সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার অধিকার।

বাংলাদেশ উল্লেখিত দু'টি কনভেনশনসহ ৩১টি আই,এল,ও, কনভেনশন অনুমোদন করেছে। আই,এল,ও, কনভেনশনের C-155 এবং C-161 কনভেনশন দুটিতে যথাক্রমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু এই দুটি কনভেনশন বাংলাদেশে এখনও অনুমোদন করা হয়নি। বর্তমান বিভিন্ন জাতীয় আইন ও বিধির বাস্তবায়নের জন্য এই দুটি আই,এল,ও, কনভেনশন গ্রহণ করা ভীষণ জরুরী। কারণ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে দেশের বিদ্যমান আইন ও বিধির দ্বারা পরিদর্শন সম্ভব। কিন্তু মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করতে আই,এল,ও, কনভেনশন দুটি অত্যাবশ্যক। শ্রমিকের মানবাধিকার সংরক্ষিত হলে তাদের নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে সাথে শ্রমিক-মালিক সৌহার্দ বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অর্জিত হবে।[১০]

৬. শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রম আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবতা

শ্রম আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তবতা :

শ্রম আইনে কারখানা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের বিধানসমূহ বাংলাদেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় যথাযথভাবে প্রয়োগ দেখা যায় না। বিগত কয়েক বছরে গার্মেন্টস কারখানায় যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, সেখানে উপরোক্ত আইনগুলো পুরোপুরি কার্যকর থাকলে নি:সন্দেহে দুর্ঘটনা সহজে এড়ানো সম্ভব হতো এবং প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক কম হতো। দুর্ঘটনা পরবর্তী পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন জরিপ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দুর্ঘটনা কবলিত গার্মেন্টস কারখানাগুলো প্রচলিত আইনের বিধান উপেক্ষা করে অপ্রশস্ত গলির ভিতরে আবাসিক বাড়িগুলোতে গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এ সমস্ত সংকীর্ণ গলির মধ্যে স্থাপিত গার্মেন্টস কারখানাতে অগ্নি দুর্ঘটনায় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। এছাড়া অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানাতে যতোক্ষণ কাজ চলে ততোক্ষণ কারখানা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। আমাদের দেশের শিল্প উদ্যোক্তারা এভাবেই বিদ্যমান আইনগুলো ভঙ্গ করে চলেছেন। ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন যথাযথভাবে কার্যকর হলে এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হতে পারে।

কারখানা আইন মোতাবেক প্রধান পরিদর্শক ও পরিদর্শকের দায়িত্বের ক্ষেত্রে বাস্তবতা

বর্তমান কারখানা আইনে বর্ণিত নীতিমালা মালিকপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধানের একমাত্র দায়িত্ব চীফ্ ইন্সপেক্টর ও ইন্সপেক্টরদের। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অভিযোগ সমূহ একমাত্র ইন্সপেক্টরগণ নিষ্পত্তি করে থাকেন। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় তাদের সংখ্যাল্পতার কারণে অনেক সময় তত্ত্বাবধানের কাজ বিঘ্নিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে ইন্সপেক্টরগণ ব্যতিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারখানা আইনের বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত অভিযোগ নিরসনের বিধান না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদেরকে আইনের বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত অভিযোগ নিয়ে বারবার ইন্সপেক্টরদের শরণাপন্ন হতে হয়। দি ডেইলী স্টারের এক রিপোর্টে বলা হয়- ৫০ হাজার রেজিস্ট্রার্ড গার্মেন্টস কারখানা মনিটরিংয়ের জন্য মাত্র ২০ জন ইন্সপেক্টর কাজ করছেন। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগের ৫ হাজার কারখানার জন্য পরিদর্শন বিভাগে ১২টি পরিদর্শক পদ বরাদ্দ আছে কিন্তু ৫টি পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পড়ে আছে। কিন্তু ইন্সপেক্টরদের সংখ্যাল্পতার কারণেই হোক বা তাদের কাজে নির্লিপ্ততার জন্য বা সংহতির অভাবেই হোক শ্রমিকেরা এ জাতীয় অভিযোগ নিয়ে ইন্সপেক্টরদের শরণাপন্ন হতে নিরুৎসাহিত বোধ করে। সে জন্য এ জাতীয় অভিযোগ শ্রম আদালতের এখতিয়ার ভুক্ত করলে অথবা পৃথক সেল গঠন করে দ্রুত তদন্ত ও বিচার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করলে উক্ত আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবতা

০৪/০৩/২০০৬ তারিখের দি ডেইলি স্টারে 'অধিকার' নামক সংস্থার এক রিপোর্টে বলা হয় গার্মেন্টসের দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের অভিযোগ দায়েরের জন্য বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মৃত্যুর সার্টিফিকেট, ওয়ারিশ সার্টিফিকেট, ওয়ার্ড কমিশনার অথবা গ্রামের চেয়ারম্যান থেকে একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে অভিযোগ দায়ের করতে হয়। নি:সন্দেহে গরীব কর্মজীবী মানুষদের পক্ষে এ সকল কাগজপত্র যোগাড় করা মোটেও সহজ বিষয় নয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সপক্ষে সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করে থাকে।[১১]

২৩/০২/২০০৬ তারিখের চট্টগ্রামে কে টি এস কারখানাতে সংঘটিত অগ্নি দুর্ঘটনায় যে ৬৫ জন শ্রমিক নিহত হয়েছিল তাদের মধ্যে ৩৫ জন শ্রমিক এমনভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল যে তাদের আর সনাক্ত করা যায়নি। প্রত্যেক শ্রমিকের সনাক্ত করার উপায় থাকা জরুরী। তা না হলে তাদের পরিবার যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাবে না। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকরা কাজ করতে আসে ফলে দুর্ঘটনার সাথে সাথে লাশ সনাক্ত করা তাদের আত্মীয়ের জন্য কঠিন হয়ে যায়। বাস্তবে দেখা যায় এই সমস্ত শ্রমিকদের বাড়িতে সংবাদপত্র বা প্রাইভেট টিভি চ্যানেল থাকে না। অগ্নিদগ্ধ শ্রমিকদের সনাক্ত করার জন্য মালিক পক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[১২] তবে ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচায়পত্র, সার্ভিস বই, শ্রমিক রেজিস্ট্রার্ড ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিককে সনাক্ত করা সহজ হবে।

১১/০৪/২০০৫ তারিখে সংঘটিত স্পেকট্রা গার্মেন্টসের ৯ তলা ভবন ধসে দুর্ঘটনায় ৪০০-এর বেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আহত হয় ৩০০-এর বেশি শ্রমিক। যদিও এটি অগ্নি দুর্ঘটনা নয় তবে এই ধরনের ভবন ধ্বসে দুর্ঘটনায় একসাথে এত শ্রমিকের মৃত্যু বাংলাদেশে প্রথম। মালিকপক্ষ ভবন ধসের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে কনট্রাক্টরদের উপর বর্তালেও মালিক পক্ষকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বিচার কার্যক্রম চলছে।[১৩]

গার্মেন্টস শিল্পের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কতিপয় প্রস্তাবনা

গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে মালিক পক্ষকে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো সচেতন হতে হবে :

* কারখানায় বিপদসংকেত প্রদানের জন্য যথাযথভাবে বিপদসংকেত যন্ত্র স্থাপন করা। যেসব কারখানায় উক্ত যন্ত্র স্থাপিত আছে সেগুলো অবশ্যই সচল রাখা।

* কারখানায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা, সেগুলো নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে কার্যকর রাখা এবং ঐগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে সকল শ্রমিককে অথবা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নেয়া।

* কারখানায় বিদ্যুৎ/গ্যাস লাইন ও ফিটিংসমূহ নিয়মিত পরীক্ষা করে ক্রটিমুক্ত রাখা এবং সে বিষয়ে শ্রমিকদের অবগত করা।

* কারখানায় বিকল্প সিঁড়ি বা জরুরী নির্গমন পথের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে ভবনের মালিকদের সাথে আলাপ-আলোচনার করা যেতে পারে।

* শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে বের হওয়ার মহড়া দেয়ার ব্যবস্থা রাখা ।

* কারখানার প্রতি ফ্লোরে হাঁটাচলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা এবং ফ্লোরকে কোন অবস্থাতেই মালামাল রাখার স্টোর হিসেবে ব্যবহার না করা ।

* কারখানার মেইন গেইট প্রশস্ত করে তৈরি করা যাতে সহজেই দুর্ঘটনার সময় একসাথে অনেক শ্রমিক বের হতে পারে। সিঁড়ি/বিকল্প সিঁড়ি বা জরুরী নির্গমন পথে কোন অবস্থাতেই মালামাল না রাখা যাতে সহজেই শ্রমিকরা যাতায়াত করতে পারে।

* জরুরী অবস্থায় কারখানায় বিপদসংকেত বাজানোর সাথে সাথে বর্হিগমনের জন্য ব্যবহৃত সিঁড়ি/বিকল্প সিঁড়ি, জরুরী নির্গমন পথের গেট উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা। এই সম্পর্কে কার্যরত নিরাপত্তা প্রহরীদেরকে স্থায়ী নির্দেশ প্রদান করা।

* কারখানার প্রতিটি সিঁড়িতে বিকল্প বাতির ব্যবস্থা করা। আপদকালীন সময়ে বের হওয়ার পথ ও সিঁড়িতে ব্যাটারি চালিত জরুরী বাতির ব্যবস্থা রাখা।

* সকল কারখানায় প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা সংরক্ষিত রাখা।

* ধুমপানের জন্য ঢাকনাসহ পিকদানী স্থাপন করা এবং ধুমপানে নিরুৎসাহিত করা।

* অল্প সময়ের মধ্যে যাতে কারখানা থেকে শ্রমিকগণ বের হতে পারে সে বিষয়ে মহড়ার/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

* দুর্ঘটনা পরবর্তী অনুসন্ধান ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা।

* আগুন নেভানোর জন্য ফায়ার হুক, গ্যাস মাস্ক, পানির ড্রাম, বালতি, হ্যান্ড গ্লাভস ইত্যাদি সংরক্ষণ করা।

অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে শ্রমিকদের করণীয় কিছু প্রস্তাবনা

* অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে শ্রমিকদের মধ্যে পোষ্টার, লিফলেট, প্রচার এবং সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

* শ্রমিকদের নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক আইন জানাতে হবে।

* কারখানার নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে।

* কারখানায় ধুমপান ও রান্না বন্ধ করতে হবে।

* শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত হতে হবে।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকারের করণীয় কিছু প্রস্তাবনা

* কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের কারখানা আইনসহ প্রচলিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নের মালিক পক্ষকে বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

* গার্মেন্টস শিল্পে যেন দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং এ ধরনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা যাতে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা নেয়া।

* গার্মেন্টস কারখানাসমূহ ঢাকা মহানগরীর বাইরে স্থানান্তরের জন্য পৃথক পোশাক শিল্প পল্লী তৈরি করা। এতে পরিবেশ দূষণ রোধ ও যানজট কিছুটা হ্রাস পাবে।

* গার্মেন্টস মালিকরা যাতে শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক যৌথ বীমার ব্যবস্থা করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

* গার্মেন্টস কারখানায় নিরাপদ বৈদ্যুতিক লাইন, চওড়া ও চলাচল যোগ্য সিঁড়ি, জরুরী বিকল্প সিঁড়ি, কার্যকর অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা, জরুরি পরিস্থিতিতে বাজানোর জন্য এলার্মের ব্যবস্থা, অগ্নিকাণ্ড হলে যাতে শ্রমিকরা নিরাপদে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারে সে জন্য নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।

* কারখানায় আগুন নিভানো ও উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ফায়ার ব্রিগেড হেলিকপ্টার সংরক্ষিত রাখা।

* কলকারখানার মালিক ও শ্রমিক নেতৃবর্গকে মানবাধিকার, সংবিধান ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।[১৪]

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও বিধান :

ইসলামী আইন মানব জীবন ও মানব দেহের নিরাপদ হেফাজতের প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে তার এই নিরাপত্তার বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সে বেকার না থেকে কর্মে নিয়োজিত হয়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বাস্তবায়ন করছে। 'নামায সমাপ্ত হলে পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ'র অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করো এবং আল্লাহ'কে পর্যাপ্ত স্মরণ কর, যাতে তোমরা সাফল্য মন্ডিত হতে পারো'।[১৫] ইসলামী আইনে মানুষের যেরূপ উচ্চমর্যাদা রয়েছে অদ্রুপ তার শ্রমেরও অত্যধিক মর্যদাও স্বীকৃত। মহানবী (স:) বলেন, 'মানুষের নিজ শ্রমে উপার্জিত আহার্য সামগ্রী তার জন্য সর্বোত্তম, তৃপ্তি দায়ক ও পবিত্র'।[১৬]

ইসলাম মালিক-শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্কের জন্য মালিকদের উপর যেমন বিভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্য ও বিধি নিষেধ আরোপ করেছে ঠিক সেভাবে শ্রমিকদের উপরও বিভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্য আরোপ করেছে। একজন শ্রমিককে কতটুকু সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংগতির উপর। শ্রমিককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং তা যথাসময়ে পরিশোধ করার জন্য রসূলুল্লাহ স. তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তোমরা তার পারিশ্রমিক দাও'।[১৭]

শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা প্রদান সম্পর্কে মহানবী স. বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের (সরকারি) কর্মচারী নিয়োজিত হবে তার স্ত্রী, বাসগৃহ ও বাহন না থাকলে আমরা তার ব্যবস্থা করবো।'[১৮] শ্রমিক নিয়োগ করে তার পারিশ্রমিক প্রদানে গড়িমসি করা বা তাকে ঠকানো মারাত্মক অন্যায়। মহানবী স. বলেন, 'সচ্ছল ব্যক্তির পাওনা পরিশোধে টালবাহানা করা জুলুম'।[১৯] মহানবী স. আরও বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী হব, তার মধ্যে একজন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে শ্রমিক নিয়োগ করল এবং তার নিকট থেকে পূর্ণরূপে কাজ আদায় করল কিন্তু তার পূর্ণ পারিশ্রমিক পরিশোধ করলো না।[২০]

শ্রমিকের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ বিষয়ে ইসলামী আইনে সুস্পষ্ট মূলনীতি ও আইনের কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে। তবে এই অধ্যায়গুলোর বিধান আজকের পাশ্চাত্য আইনের মত সুবিন্যস্ত নয়। কারণ শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইসলামী আইনে এসব অধ্যায় সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। শ্রমিকদের আহত বা নিহত হওয়া জনিত ক্ষতিপূরণ করার জন্য কিসাস অধ্যায়ের অধীন 'দিয়ত' 'আকিলা'-এর অধীন ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামী আইনে কোন শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে 'আকিলা' নীতির আওতায় স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব বহন করবে। ক্ষতিপূরণ প্রদানের সর্বশেষ সংস্থা হল দেশের সরকার। এ বিষয়ে বর্তমান আইন ব্যবস্থাকে সামনে রেখে ইসলামী আইনের গবেষণা হওয়া দরকার এবং প্রতিটি অধ্যায়ের বিধিবদ্ধ আকারে আইনের কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন।

সর্বশেষে বলা যায় গার্মেন্টস শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ শিল্পকে জাতীয় প্রয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা জরুরী। একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি বিধিমালা মেনে চলা আবশ্যক।

গার্মেন্টস কারখানায় মালিকপক্ষ মূলধন বিনিয়োগ করে থাকেন। ব্যবসায় ব্যবসায়িক সুনাম, পন্যের যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ ও সময়মতো মালামাল শীপমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে উৎপাদনে সম্পৃক্ত সকলকে মনোযোগী হতে ও সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। সমাজে একজনের কর্তব্যই অন্যজনের অধিকার নিশ্চিত করে। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকের কর্তব্য হচ্ছে, সঠিক শ্রম প্রদানের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন লক্ষমাত্রা অর্জন করা অর্থাৎ মালিকের অধিকারকে নিশ্চিত করা। অন্য দিকে মালিকের কর্তব্য হচ্ছে শ্রমিকের সকল প্রকার নিরাপত্তা বিধানসহ তাদের ন্যায্য মজুরী ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যা শ্রমিকের অধিকার তথা মানবাধিকার হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কারখানায় মানবাধিকার বাস্ত বায়নের মাধ্যমেই কেবল শ্রমিকের নিরাপত্তা ও উৎপাদনের লক্ষমাত্রা অর্জন সম্ভব।[২১]

এছাড়া দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ পাওয়া একটি স্বীকৃত মানবাধিকার। আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান করা'। অতএব শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব সরকারেরও।[২২] বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত একটি দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকার, মালিক ও শ্রমিক এ তিন পক্ষের সমন্বিত ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় উন্নয়ন তাদের এ সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি ইসলামের আদর্শে শ্রমের যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানে সকল মানুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সমতা বজায় রাখতে হবে। তবেই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ শিল্প আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান 'বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন', দি এ্যানজেল পাবলিকেশন, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৯ পৃ-৬৪৯।
২. এন.এ.এম.জসিম উদ্দিন "বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইন সমূহ" সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭, পৃ-৩
৩. A News letter of Bangladesh Garment Manufactures & Export Association, April-May 2006, p-3
৪. A News letter of Bangladesh Garment Manufactures & Export Association, April-May 2006, p-9
৫. গাজী শামছুর রহমান "শ্রম ও শিল্প আইন" আলিপুর প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ-২১১
৬. মোহাম্মদ ফারুক খান "শ্রম ও শিল্প আইন" ডাইনামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০২,পৃ-২৬২
৭. A Research on" Globalization and recent economic debate: impact or the state of female garments workers of Bangladesh"

Women's economic empowerment project: Bangladesh National Women Lawyers Association Supported by the Asia foundation Dhaka.
৮. দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা, ২৯/০৮/২০০৬, পৃ-১৭
৯. এন.এ.এম.জসিম উদ্দিন 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইন সমূহ' সেন্ট্রাল ল বুক হাউজ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭, পৃ-১৯৪, ১৯৭, ২৪৯
১০. Dr. Burhan Uddin Khan, "The ILO Convention on Forced labour: A legal review of its impact and implications in Bangladesh", Journal of The faculty of Law, vol. 14(1), June. 2003, pp-38, 39
১১. Alok Sarkar "Strict enforcenment of law can contain garment disasters" The Daily Star " Law & our rights", 4 March 2006, p-22
১২. Annie, Nasrin Siraj "Working dying in Garment factories: Some question" Magazin of Meghbarta 14 March, 2006
১৩. Salauddin, Sheikh "Collapse of Spectrum Sweateer Industries" The Daily Star " Law & our rights", June 6, 2006, p-23
১৪. আকরাম হোসেন চৌধুরী "কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকার মালিক, শ্রমিক, আই.এল. ও এবং এনজিওদের করনীয়" একটি সেমিনার পেপার, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৭
১৫. সূরা আল-জুমুআ, আয়াত নং ১০
১৬. ইবনে মাজা, তিজারাত, বাব ১, নং ২১৩৭; বুখারী বুয়ূ, বাব ১০; তিরমিযী, আহ্কাম, বা ২২, নাসাঈ, বুয়ূ, বাব ১(আরও বহু স্থানে)
১৭. ইবনে মাজা, আশুয়াবুর-রাহ্ন, বাব ৪, নং ২৪৪৩
১৮. আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, বাব ৯, নং ২৯৪৫। অপর হাদীসে বাহনেরও উল্লেখ আছে।
১৯. বুখারী হাওয়াত, বাব ১ ও ২, নং ২২৮৭ ও ২২৮৮, আরও দ্র. মুসলিম (মুসকাত), আবু দাউদ(বুয়ূ), তিরমিযী (ঐ), নাসাঈ(ঐ), ইবনে মাজা (সাদাকাত)
২০. বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাব ১০ নং ২২৭০, আরও দ্র. কিতাবুল বুয়ূ. বাব ১০৬ নং ২২২৭
২১. Dr. Pratima Paul-Majumder, "Social security challenges in the Manufacturing sector: A Gender perspective: Human rights in Bangladesh 2004, published by Ain O Salish kendra (ASK), Dhaka first published 2005, pp-174, 176
২২. Farmin Islam "Development of State Policy and labour legislation in Bangladesh: Implications for women in Industrial Employment"; A Journal of women for women, vol-7, 2000, Dhaka p-86

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ৮১-৯৫

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

॥ দশ ॥

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যদি কারো কোন অংগ কেটে যায় অথবা কোন অংগের কার্যকারিতা ও উপকারিতা রহিত হয়ে যায় কিন্তু এর বিচারের প্রশ্নে কিসাস কার্যকরি হওয়ার জন্যে যেসব শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী এক্ষেত্রে সেসব শর্তাদির কোন একটির যদি ঘাটতি থাকে, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়[১] কিংবা এই অপরাধমূলক কাণ্ডটি সম্পূর্ণ ভুলবশত ঘটে থাকে তাহলে উল্লেখিত সব অবস্থাতেই কিসাস কার্যকরি হবে না, দিয়্যত ওয়াজিব হবে। কারণ এগুলো এমন অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে যেগুলোতে কিসাস কার্যকরি হয় না। এ ধরনের অপরাধ ইচ্ছাকৃত হোক আর অনিচ্ছাকৃত তার শাস্তির ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়ে না। উল্লেখিত উভয়বিধ অপরাধের ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা সাব্যস্ত হবে। এটিই জমহুরে ফুকাহার অভিমত।[২]
উল্লেখিত অপরাধে কখনো পূর্ণ দিয়্যত সাব্যস্ত হয়, কখনো অর্ধেক দিয়্যত আবার কখনো অনির্দিষ্ট (Unprescribed) জরিমানা ধার্য করা হয়।

পূর্ণ দিয়্যতের ক্ষেত্র

যদি কোন অংগের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় তখন পূর্ণ দিয়্যত ওয়াজিব হয়। এটি দুই ধরনের হতে পারে।
১. কর্তিত অংগের কার্যকারিতা উপযোগিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া।
২. অংগ তার অবস্থানে বহাল থাকাবস্থায় কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া।
উভয় অবস্থাতেই অংগের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়।[৩] এমতাবস্থায় কর্তিত অংগটি যদি মানবদেহে মাত্র একটি থাকে তবে পূর্ণ দিয়্যত সাব্যস্ত হবে। একাধিক অংগ থাকলেও যদি অংগটি সম্পূর্ণ কাটা পড়ে কিংবা এর কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় তবে পূর্ণ দিয়্যত সাব্যস্ত হবে। যেমন, হাড়সহ সম্পূর্ণ নাক যদি কেটে যায় অথবা জিহ্বা কিংবা প্রজনন অংগ কাটা পড়ে। এসব অংগ শরীরে একাধিক থাকে না। এসব অংগের কোন একটি কাটা পড়লে জীবনের জন্যে সেই ব্যক্তির অংগহানি ঘটে। কখনো সে এসবের উপকারিতা ভোগ করতে পারে না। ফলে এসব অপরাধে পূর্ণ দিয়্যত সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে রসূল স. এর একটি হাদীসও বর্ণিত আছে।

যদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কোন অংগের শুধু উপকারিতা ও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়, অংগ যথাস্থানে বহাল থাকে, যেমন ঘ্রাণশক্তি কিংবা স্বাদ অনুভব শক্তি রহিত হয়ে যায় সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্তের বোধ জ্ঞান শক্তিও লোপ পায় তাহলে উল্লেখিত প্রত্যেকটির বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন দিয়্যত বা জরিমানা ধার্য হবে। কেননা, কোন অংগের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতেই দিয়্যত ধার্য হয়ে থাকে। হযরত উমর রা. এর শাসনামলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির পায়ে আঘাত করে। এই আঘাতের কারণে আক্রান্ত লোকটির বাকশক্তি দৃষ্টিশক্তি এবং বোধ ও জ্ঞান সবই লোপ পায় সেই সাথে তার কাম শক্তিও রহিত হয়ে যায়। এই মোকদ্দমায় হযরত উমর রা. চারটি জরিমানা ধার্য করেছিলেন। কেননা এসব অংগের কার্যকারিতা ও উপকারিতা সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গিয়েছিল।[৪]

কারো অন্যায় আঘাতে যদি আহত ব্যক্তির এমন কোন অংগ নষ্ট হয়ে যায় যে অংগ মানবদেহে একাধিক থাকে। যেমন চোখ, কান, হাত পা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নবী করীম স. থেকে বর্ণিত আছে, এ ধরনের দু'টি অংগের বিপরীতে পূর্ণ দিয়্যত জরুরী।[৫]

কারোর অন্যায় আঘাতে যদি ক্ষতিগ্রস্তের কোন অংগের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত অংগ দৃশ্যত বহাল থাকে। যেমন চোখ দৃশ্যত বহাল থাকে কিন্তু চোখের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, অনুরূপ দৃশ্যত কান ঠিকই রয়েছে কিন্তু শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায়ও অপরাধীকে পূর্ণ দিয়্যত পরিশোধ করতে হবে। কেননা এসব অংগের উপকারিতা সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই অংগ দৃশ্যত বহাল থাকা না থাকা কোন গুরুত্ব বহন করে না।[৬] উপরে হযরত উমর রা. এর যে ফয়সালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে দৃশ্যত অংগ ঠিক থাকলেও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এজন্যই হযরত উমর রা. পূর্ণ দিয়্যত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমন কোন অংগ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানব দেহে যে অংগ দুয়ের বেশি থাকে এবং অন্যায় আঘাতে সবগুলোরই কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায়ও পূর্ণ দিয়্যত ওয়াজিব হবে। যেমন কারো অন্যায় আঘাতে যদি চোখের পাতার কোন প্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা চোখের পাতার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং তাতে পাপড়ী গজানো বন্ধ হয়ে যায় অথবা চোখের সম্পূর্ণ পাতায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক ব্যক্তির চারটি চোখের পাতার সবগুলোই যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পূর্ণ দিয়্যত দিতে হবে। অথবা চোখের পাতা বহাল থাকলেও যদি এগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় তবুও পূর্ণ দিয়্যত ওয়াজিব হবে।[৭]

উপরে আমরা যেসব ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়্যত ওয়াজিব হয় এ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এছাড়া এমন অবস্থা হতে পারে যাতে দিয়্যতের অংশ বিশেষ সাব্যস্ত হয়, আবার কখনো এমন অবস্থাও হতে পারে যাতে নির্ধারিত দিয়্যতের চেয়ে বেশি ধার্য করা হয়।

যে অবস্থায় দিয়্যতের অংশ বিশেষ নির্ধারণ করা হয়

মানবদেহে যেসব অংগ দুটি থাকে তন্মধ্যে একটি যদি কারো অন্যায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা তার তার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় যেমন, হাত, কান, চোখ বা ঠোঁটের একটি নষ্ট হয়ে যায়।[৮]

উদাহরণত বলা যায়, অপরাধী কাউকে আঘাত করল, তাতে আহত ব্যক্তির উল্লেখিত অংগগুলোর কোন একটি নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু কোন যৌক্তিক কারণে অপরাধীর উপর কিসাস সাব্যস্ত হলো না, কিংবা আঘাতটি ছিল নিতান্তই ভুলক্রমে। এমতাবস্থায় অপরাধীর উপর অর্ধেক দিয়্যত ওয়াজিব হবে।[৯] অন্যায় আঘাতে অংগটি কেটে গিয়ে থাকুক বা এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে থাকুক।[১০] কারণ রসূল স. এক পত্রে আমর ইবনে হাযমকে এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাতে এও বলেন, মানবদেহে যে অংগ দু'টি থাকে তন্মধ্যে একটি যদি কারো আঘাতে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা দৃশ্যত অংগ ঠিক থাকলেও এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এই অংগের অর্ধেক কার্যকারিতার বিলুপ্তি ঘটেছে।

আবার কখনো এক চতুর্থাংশ দিয়্যতও ওয়াজিব হয়। মানবদেহে যদি কোন অংগ চারটি থাকে আর তন্মধ্যে কোন একটি কারো অন্যায় আঘাতে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা কার্যকারিতা লোপ পায়। যেমন কারো আঘাতে চোখের একটি পাতার কোণা নষ্ট হয়ে গেল, তাতে চোখের পাপড়ী গজানো বন্ধ হয়ে গেল। অথবা চোখের পাতার কোন ক্ষতি হলো না, শুধু পাপড়ী কেটে গেল, অথবা চোখের পাতাও ক্ষতিগ্রস্ত হলো, এমতাবস্থায় এক তৃতীয়াংশ দিয়্যত ওয়াজিব হবে।[১১]

এছাড়া এমন অবস্থাও হয় যাতে এক দশমাংশ দিয়্যত ওয়াজিব হয়। যেমন কারো অন্যায় আঘাতে যদি কারো হাত পায়ের আঙুলের কোন একটি কেটে যায়, তাতে নির্ধারিত দিয়্যতের এক দশমাংশ ওয়াজিব হবে। কেননা রসূল স. ইরশাদ করেন, প্রতিটি আঙুলের বিপরীতে দশটি উট জরিমানা দিতে হবে।[১২]

কখনো আবার জরিমানা বা দিয়্যতের পরিমাণ আরো কম হয়। যেমন এক দাঁতের জরিমানা নির্ধারিত পূর্ণ জরিমানার বিশ ভাগের এক ভাগ। দাঁতের ক্ষেত্রে সব দাঁতেরই জরিমানাই সমান। এ ব্যাপারেও রসূল স. এর হাদীস রয়েছে।[১৩]

অনুরূপ যে আঙুলে দু'টি জয়েন্ট বা গিরা রয়েছে তন্মধ্যে যদি একটি কারো অন্যায় আঘাতে কেটে যায় তাতেও বিশ ভাগের এক ভাগ দিয়্যত ওয়াজিব হবে। কেননা, পূর্ণ একটা আঙুলে এক দশমাংশ ওয়াজিব হয়ে থাকে। তাই একটি আঙুলের একটি জোড়ার ক্ষতির বিপরীতে পূর্ণ আঙুলের অর্ধেক সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ যে আঙুলের তিনটি জোড়া বা গিরা আছে, তন্মধ্যে যদি একটি কারো অন্যায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এর কার্যকারিতার বিলুপ্তি ঘটে তবে একটি পূর্ণ আঙুলের জরিমানার এক তৃতীয়াংশ সাব্যস্ত হবে।[১৪]

বর্ধিত দিয়্যত

যেসব ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিয়্যতের চেয়ে অতিরিক্ত জরিমানা ধার্য করা হয় এর উদাহরণ : কারো অন্যায় আঘাতে যদি কোন লোকের সবগুলো দাঁত পড়ে যায় এবং কোন কারণে যদি এক্ষেত্রে কিসাস রহিত হয়ে যায়। অথবা অবস্থা যদি এমন হয় যে, এমন কোন আঘাতে দাঁত ভেঙে যায় যে আঘাতটি সম্পূর্ণ ভুলবশত ঘটে থাকে, এমতাবস্থায় পূর্ণ দিয়্যতের সাথে আরো তিন পঞ্চমাংশ

$^3/_5$ অতিরিক্ত জরিমানা দিতে হবে।[১৫] কেননা সাধারণত প্রত্যেক লোকের বত্রিশটি দাঁত থাকে। প্রতিটি দাঁতের জরিমানা বা দিয়্যত $^1/_{20}$ বিশ ভাগের একাংশ তাই (৩২) বত্রিশ দাঁতের জরিমানা $^3/_5$ তিন পঞ্চমাংশ হয়। এক্ষেত্রে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, কোন অপরাধজনিত কারণে কোন অংগ বিনষ্ট হোক অথবা এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাক উভয় অবস্থাতে একই বিধান কার্যকরি হবে।[১৬]

অনির্ধারিত দিয়্যত

কোন ঘটনায় যদি কিসাস, দিয়্যত কিংবা নির্দিষ্ট কোন জরিমানা (Prescribed Damages) না থাকে তাহলে অনির্দিষ্ট জরিমানা (Unprescribed Damages) ওয়াজিব হবে। যাতে অপরাধমূলক আঘাতে ক্ষয় ক্ষতি বিনা ভর্তুক্তিতে থেকে না যায়। এবং এ ধরনের অপরাধ কর্ম ঘটানোর পরও অপরাধী বিনা শাস্তিতে আরো অপরাধপ্রবণ না হয়ে ওঠে।[১৭] অনির্দিষ্ট জরিমানাকে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা (Proper Damages) অথবা ন্যায় বিচার (Judicial Decision) বলা হয়। শরীয়তে যদি কোন ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শাস্তি কিংবা আর্থিক জরিমানার বিধান না থাকে সেক্ষেত্রে বিচারক এ ধরনের ফয়সালা দিতে পারেন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে কিসের ভিত্তিতে বিচারক জরিমানা নির্ধারণ করবেন? ইমাম তাহাবী র. বলেন, এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে একজন সুস্থ সবল গোলামের সাথে তুলনা করে তার দিয়্যত নির্ধারণ করবেন। অতঃপর সেই ধারণাকৃত গোলামটিকে আহত বিবেচনা করে তার জরিমানা নির্ধারণ করবেন। এরপর এই দু'টির মধ্যে পর্যালোচনা করে ব্যবধান নির্ণয় করা হবে। এই ব্যবধানটি হবে নিম্নতম দিয়্যতের পরিমাণ। ইসলামী আইনের ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'আলহুকুমাহ' অথবা 'হুকমুল আদল' আদালতের ন্যায়সঙ্গত জরিমানা।

ইমাম কারখী র. বলেন, যেসব অপরাধের কোন নির্দিষ্ট জরিমানা বা শাস্তি নেই, সেগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাছাকাছি এমন অপরাধের সাথে তুলনা করতে হবে যেগুলোর জরিমানা নির্দিষ্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে দু'জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষত ও জীবনের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করবেন। বিচারক অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামতের ভিত্তিতে রায় দিবেন। ইমাম কারখী বলেন, বর্ণিত প্রথমোক্ত মতের ভিত্তিতে ফয়সালা করলে এ বিষয়টি সামনে আসে যে, মাথার খুলী বা মাথার যে কোন ছোট্ট আঘাতেও মোটা অংকের জরিমানা সাব্যস্ত হবে এবং মাথার বিপরীতে শরীরের অন্যান্য জায়গায় বড় ক্ষতের ক্ষেত্রেও কম জরিমানা ধার্য হবে। যেমন কোন গোলামের আঘাতে যদি গোশতের নিচের ও হাড়ের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে এর জরিমানা হবে বিশ ভাগের এক ভাগের বেশি। গোলামের সাথে তুলনা করে যদি কোন আযাদ লোকের জরিমানা নির্ধারণ করা হয়, তাহলে একই ধরনের আঘাতের জরিমানা বেশি হবে অথচ এটা জায়েয নয়। পূর্বোল্লেখিত মতামতের দলীল হলো সেই উক্তি 'আযাদ ও গোলামের জরিমানার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই উভয়ই সমান।'[১৮]

যেসব ক্ষেত্রে ন্যয়সঙ্গত জরিমানা অথবা অনির্দিষ্ট জরিমানা ধার্য হয় এমন অপরাধের উদাহরণ

কেউ যদি কারো কোন অংগ জোড়ের আধাআধি স্থানে কেটে ফেলে এমতাবস্থায় জমহুরের মতে কিসাস প্রয়োগ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন জরিমানার বিধানও নেই। তাই এতে অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হবে।[১৯]

শরীরের কোন হাড় যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাতেও কোন কিসাস প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং তাতে নির্দিষ্ট জরিমানা নেই। এক্ষেত্রে পূর্বোল্লেখিত অবস্থার মতো অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হবে। এটিই জমহুরের অভিমত। কেননা, উল্লেখিত অবস্থায় ক্ষতির সমপরিমাণ কিসাস প্রয়োগ অসম্ভব। সেই সাথে যেসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জরিমানার বিধান নেই, সেসব ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট জরিমানার বিধান কার্যকরি হবে।[২০]

শরীরের অতিরিক্ত অংগের বিচারের ক্ষেত্রেও অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হবে। যেমন অতিরিক্ত আঙুল। এতে যেমন কোন কিসাস নেই তদ্রূপ নির্দিষ্ট জরিমানার বিধানও নেই। কেননা অতিরিক্ত আঙুলের দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না এবং তা মানবদেহের কোন সৌন্দর্যও বর্ধন করে না। অবশ্য অতিরিক্ত হলেও তা মানবদেহের একটি অংশ। বস্তুত মানব দেহ ও মানব জীবনের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা ওয়াজিব। যদিও এর দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না কিংবা সৌন্দর্য বর্ধন করে না। অবশ্য অতিরিক্ত অংগ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মানুষ কষ্ট পায় এবং তাতে জখম হলে দৃষ্টিকটু লাগে। তাই মানব দেহের যে কোন অংশই ক্ষতিগ্রস্ত হোক না কেন তাতে জরিমানা অবশ্যই সাব্যস্ত হবে।[২১]

অনুরূপভাবে যে অংগ তার সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে অক্ষম সেগুলোর ক্ষয়ক্ষতিতেও কিসাস ওয়াজিব হয় না এবং তাতে নির্দিষ্ট কোন জরিমানার বিধানও নেই। যেমন বোবা মানুষের জিহবা।[২২] যে চোখের দৃষ্টি শক্তি নেই।[২৩] অকার্যকর হাত বা পা।[২৪] প্রজনন ক্ষমতা রহিতকৃত ব্যক্তি কিংবা পুরুষত্বহীন ব্যক্তির বংশদণ্ড।[২৫]

এগুলোতে কিসাস নেই। কারণ অকার্যকর এসব অঙ্গের থাকা আর না থাকার মধ্যে উদ্দেশ্যগত কোন পার্থক্য নেই। শরীয়তের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন জরিমানার বিধান নেই। তবুও যেহেতু এসব অংগ মানবদেহের অংশ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে মানবদেহ অত্যন্ত সম্মানিত ও অর্থবহ (Guaranteed) বস্তু। যদিও এগুলোর অর্থবহ কার্যকারিতা নেই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঠিকই কষ্ট পায় এবং তার দৈহিক সৌন্দর্য এবং গঠনেও কিছুটা বিকৃতি গোচরীভূত হয় ফলে এগুলোর ক্ষতি সাধনে অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হবে।

মাথা ও মুখমণ্ডলের যখমের প্রকারভেদ এবং এর বিধান

শাজাজ : মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমকে বলে শাজাজ। শাজাজের সংগা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, শাজাজ মাথা ও মুখমণ্ডলের ঐ অংশকে বলা হয় যে অংশে হাড় রয়েছে। এসব জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হওয়াকে বলে শাজাজ। যেমন মাথা

ও গালের উপরের অংশ যে স্থানে (Malar Bone) হাড় রয়েছে। অথবা চিবুক বা কানপট্টির শক্ত অংশ। ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে সাধারণত শাজাজ বলতে মাথা ও চেহারার ঐ আঘাতকে বোঝানো হয় যা মগজের উপরিঅংশ (Meninges)-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এবং আরো কিছু সংখ্যক ফকীহ বলেন, মাথা এবং চেহারা ছাড়াও শরীরের অন্য অংশও যদি এ ধরনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তাকেও শাজাজ বলা হবে। কিন্তু জমহুরের বক্তব্য হলো, শাজাজ শব্দ শুধু মাথা ও চেহারার আঘাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মাথা ও চেহারা ছাড়া শরীরের অন্যান্য আঘাতের ক্ষেত্রে জখম (Wound) শব্দ ব্যবহৃত হয়।[২৬]

মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাতের প্রকারভেদ

ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে শাজাজ এগারো (১১) প্রকার : হারিসা, দামুআ, দামিয়া, বাদ্বিগা, মুতালাহিমা, সামাহাক, মুযিহাহ্ হাশিমাহ, মুনকালাহ্, আম্মাহ্ এবং দামিগা।
ইমাম মুহাম্মদ র. নয় প্রকার শাজাজের উল্লেখ করেছেন। তিনি হারিসা এবং দামিগার উল্লেখ করেননি।[২৭]
ইমাম মালিক র. এর দৃষ্টিতে শাজাজ দশ প্রকার। তিনি হাশিমার উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন চেহারা ও মাথা ছাড়া অন্যান্য জায়গার আঘাতকে হাশিমাহ বলা হয়।
ইমাম মালিক র. দশ প্রকারের প্রথমে উল্লেখ করেন, দামিয়া, হারেসা, সামাহাক, বাযিয়াহ, মুতালাহিমা। অতঃপর ষষ্ঠ স্থানে তিনি 'মাতাহ' নামে এক প্রকার আঘাতের নাম দিয়েছেন।[২৮]
ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. মতেও শাজাজ দশ প্রকার। এ দুজন ইমাম 'দামিয়া' কে বাদ দিয়েছেন। এই দু'জনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে ইমাম আহমদ র. দামিয়াকে বাযিলাও বলে থাকেন। সেই সাথে এ দু'জন 'আম্মাহ-কে মামুমাও বলেন।[২৯]

বিভিন্ন ধরনের শাজাজ অর্থে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ

উপরে শাজাজের প্রকার বলে কতিপয় আরবী শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী আইনে এগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ আঘাতের অর্থ প্রকাশ করে। নিম্নে সেগুলোর বিস্তারিত প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দেয়া হলো।
১. হারিসা : (Scratch) ছিলে যাওয়া, চামড়া উঠে যাওয়া। এটি এমন ধরনের জখম যা শুধু চামড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিন্তু তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় না। আরবী ভাষায় বলা হয় 'হারাসাল কাসসারু ছাওবা' ধোপা কাপড় ফেড়ে ফেলল বা ঘষতে ঘষতে ছিঁড়ে ফেলল।
২. দামুআ : (Tearer) এমন আঘাত যাতে চোখের পানির মতো রক্ত টলমল করতে থাকে কিন্তু ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় না।
৩. দামিয়া : (Bleeding) রক্তক্ষরণ। অর্থাৎ যে জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। কেউ কেউ বলেন, দামিয়া হলো এমন জখম যে যখমে রক্ত দেখা যায় কিন্তু রক্ত সেখান থেকে প্রবাহিত হয়

না। যদি এই বক্তব্যকে সঠিক ধরে নেয়া হয় তাহলে দুই নম্বরে উল্লেখিত 'দামুআ'র অর্থ করতে হবে এমন জখম যা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়।

৪. বাযিআ : (Dissection) এমন জখম যাতে চামড়া ফেটে যায়।

৫. 'মুতালাহিমা' : এমন জখম যাতে গোশত ফেটে যায় তবে ফাটার পর সেখানকার গোশত আবার মিশে যায় এবং কর্তিত স্থান জোড়া লেগে যায়। ইমাম মুহাম্মদ র. থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে, মুতালাহিমা বাযিআ'র আগে হবে। 'মুতলাহিমা' শব্দটি আরবী 'ইলতাহামা শাইআন' থেকে চয়নকৃত। অর্থ দু'টি জিনিস পরস্পর মিলে যাওয়া, জড়িয়ে থাকা। এক্ষেত্রে মুতালাহিমার অর্থ দাঁড়ায় চামড়ার নীচের গোশত গোচরীভূত হবে ঠিক কিন্তু গোশত কাটেনা। আর বাযিআর ক্ষেত্রে চামড়ার নীচের গোশতও কাটা পড়ে। ফলে সেটির ক্রমিক মুতালাহিমার পরে হবে। বস্তুত ব্যাপকভাবে এটাই চর্চিত যে মুতালাহিমা অর্থই হচ্ছে চামড়ার নীচের গোশত ফেটে যাওয়া। এ অর্থে বাযিআর স্থান এর আগে।

৬. 'সামাহাক' (Periosteum) : এ ধরনের জখম যে জখম গোশত ও হাড়ের মাঝখানে যে পাতলা আবরণ থাকে সেই পর্যন্ত পৌছে যায়। এ ধরনের আঘাতে চামড়ার নীচের গোটা গোশতই কেটে যায় শুধু হাড়ের উপরে পাতলা পিচ্ছিল আবরণ অক্ষুণ্ন থাকে।

৭. 'মুযিহাহ' (Reaches to Bone) : এ ধরনের আঘাত যাতে হাড় পর্যন্ত দেখা যায়। এই আঘাতে চামড়া গোশত ও হাড়ের উপরের পিচ্ছিল আবরণ পর্যন্ত কেটে যায়।

৮. হাশিমাহ : এমন আঘাত যাতে হাড় ভেঙে যায় বটে কিন্তু স্বস্থানে বহাল থাকে।

৯. মুনকালাহ : এমন আঘাত যা হাড়কে ভেঙে দেয়ার সাথে সাথে হাড়কে স্থানচ্যুত করে ফেলে।

১০. উম্মাহ : এমন আঘাত যা মগজের আবরণ পর্যন্ত পৌছে যায়। যে আবরণ মগজকে এক সাথে জমিয়ে রাখে।

১১. দামিগা : এমন জখম যা মগজ পর্যন্ত পৌছে যায়। ইমাম মুহাম্মদ র. এ প্রকারটির উল্লেখ করেননি। কেননা মগজে আঘাত লাগলে কিংবা রক্তক্ষরণ হলে সাধারণ মানুষ আর জীবিত থাকে না, ফলে এই আঘাত আর শাজাজ পর্যায়ে থাকে না, সরাসরি হত্যার পর্যায়ে চলে যায়।[৩০]

মাথা ও চেহারার আঘাতে কিসাসের বিধান

ফকীহদের অভিমত এই যে, বর্ণিত সপ্তম পর্যায় অর্থাৎ 'মুযিহাহতে' কিসাস সাব্যস্ত হবে। কেননা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ 'ওয়াল জুরুহু কিসাস' সব ধরনের যখমেই কিসাস রয়েছে। মুযিহাহও এক প্রকার জখম। তাছাড়া এ ধরনের আঘাতেও যখমের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে যে সীমার ভেতরে থাকলেই কেবল তা মুযিহাহ হিসেবে আখ্যায়িত হয়। এতে যথার্থ প্রতিদান নেয়াও সম্ভব। কারণ এর কিসাসে ব্যবহৃত অস্ত্র বা যন্ত্র হাড়ের আগে থামিয়ে দেয়া সম্ভব।[৩১] মুযিহাহ-এর পর জখমের যেসব প্রকার বা পর্যায় রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ফকীহগণ একমত যে এসবের মধ্যে কিসাস কার্যকরি হবে না। কারণ পরবর্তী সবগুলোর মধ্যেই হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর হাড় জখমে

কোন কিসাসের বিধান নেই। কারণ এক্ষেত্রে অপরাধের ঠিক সমপরিমাণ শাস্তি নিশ্চিত করা অসম্ভব। হাশিমাতে হাড় ভেঙে যায়, মুনকালাতে হাড় ভেঙে স্থানচ্যুত হয়ে যায়। উম্মাতেও যদি কিসাস কার্যকরি করা হয় তাহলে তাতে এই আশংকা থেকে যায় যে প্রতিবিধান করতে গিয়ে অপরাধীর জীবনহানি ঘটে যাবে। অথবা অপরাধের চেয়ে অপরাধীকে বেশি শাস্তি দেয়া হয়ে যাবে। 'দামিগা'র ক্ষেত্রেও এই আশাংকা বিদ্যমান।[৩২]

ক্রমধারায় 'মুযিহাহ' এর আগে যে কয়প্রকার জখমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এগুলোতে কিসাস কার্যকরি হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক র. বলেন, সেগুলোতেও কিসাস কার্যকরি হবে। কারণ এ ধরনের আঘাতে অপরাধীকে অনুরূপ শাস্তি দেয়া সম্ভব।[৩৩]

ফকীহ হাসান সূত্রে ইমাম আবু হানিফা র. এর মতামত বর্ণিত হয়েছে, মুযিহাহতে কিসাস ওয়াজিব। সামাহাকে যদি কিসাস কার্যকরি সম্ভব হয় তবে তাতেও কিসাস ওয়াজিব হবে।[৩৪] জাহেরী রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মুযিহাহ'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধেও কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ এগুলোতে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি প্রয়োগ সম্ভব।[৩৫]

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, মুযিহার আগে বর্ণিত জখমে কিসাস কার্যকরি হবে না। কারণ এ ধরনের জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে না। ফলে এগুলোর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। যে জখমের দৈর্ঘ্য ও গভীরতা পরিমাপ করা যায়, সেক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগের সীমালংঘনের আশংকা দূরীভূত হয়ে যায়। এখানে বাযিআ ও সামাহাক এর জখমে কিসাস প্রয়োগ করতে গেলে তা মুযিহাহ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। অথবা এমনও হতে পারে সামাহাক এর কিসাস প্রয়োগের আঘাত মুযিহাহর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কেননা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আঘাত গোশতের ভেতরে এ পরিমাণ গভীর হতে পারে এর শাস্তি প্রয়োগ করতে গেলে অপরাধীর জখম মুযিহা বা সামাহাকে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।[৩৬]

ক্রমধারায় মুযিহার পর শাজাজ এর যে কয়টি প্রকার বলা হয়েছে, এগুলোতেও অন্যান্য আলেমগণের মতো ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. এর মত একই। অর্থাৎ এগুলোতে কিসাস কার্যকরি হবে না। কারণ এগুলোতে অপরাধীর উপর পুরোপুরি শাস্তি প্রয়োগ সম্ভব নয়। অবশ্য এগুলোতে পুরোপুরি প্রতিদান নেয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। তবে ইমামদ্বয় এ মতামতও ব্যক্ত করেন, বর্ণিত অপরাধের বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মুযিহার অপরাধীর উপর কিসাস নেয়ার অধিকার রাখে। কারণ ক্রমানুসারে এরপরই যে জখমের বর্ণনা রয়েছে, তা মুযিহার চেয়ে বেশি কঠিন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অপরাধীর উপর মুযিহার প্রতিশোধ নিয়ে নেয় তাহলে সে তার প্রাপ্যের একটা অংশ নিয়ে নিলো।

অবশ্য ইমাম শাফেয়ী র. একথাও বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এই অধিকারও থাকবে মুযিহার প্রতিশোধ নেয়ার পর এর পরবর্তী ধাপের ক্ষয়ক্ষতির সাথে এর যে পার্থক্য হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি চাইলে সে এতটুকুর জন্য জরিমানাও উসূল করতে পারবে। কেননা, আহত ব্যক্তি যে পরিমাণের

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অপরাধীর এ পরিমাণ ক্ষতি করা সম্ভব না হলে অবশিষ্টাংশের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জরিমানা প্রাপ্তির অধিকারী হওয়া যুক্তিসংগত।

মুজিহাহ এর চেয়ে বেশি আঘাতে কিসাস প্রয়োগ সম্ভব নয়, ইমাম শাফেয়ীর এমতের সাথে হানাফীদের অনেকেই একমত। তবে হানাফীদের একাংশের বক্তব্য হলো, অতিরিক্তের জন্যে জরিমানার অধিকারী হবে না। কারণ তাহলে একই অংগের শাস্তি কিসাস ও জরিমানা উভয়টি একত্রিত হয়ে যায়, যা আইনত বৈধ নয়।[৩৭]

মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমে জরিমানা

ইচ্ছাকৃত কোন অপরাধে যদি কিসাস কার্যকরি করা সম্ভব না হয়, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিসাসের পরিবর্তে জরিমানা সাব্যস্ত হবে।[৩৮] এই জরিমানা কখনো নির্দিষ্ট হয় আবার কখনো অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত, ক্রমধারায় মুযিহাহ এর পূর্ববর্তী সকল জখমের কোন নির্দিষ্ট জরিমানা নেই।[৩৯] অবশ্য ইমাম আহমদ র. থেকে একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে, দামিয়াতে একটি উট, বাযিআয় দু'টি উট, মুতালাহিমায় তিনটি উট এবং সামাহাকে চারটি উটের জরিমানা হবে। দলীল হিসেবে এর প্রমাণে বলা হয়, সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত এই জরিমানার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। তবে এটি হাম্বলীপন্থীদের সর্বজনগ্রাহ্য মতামত নয়।[৪০]

মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমের ক্রমধারায় মুযিহার পরের জখমগুলোর অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্দিষ্ট

১. জমহুর ফকীহগণের মতে মুযিহার নির্দিষ্ট জরিমানা (৫) পাঁচটি উট। আঘাত মাথায় হোক আর মুখমণ্ডলে হোক তাতে কোন তারতম্য নেই।[৪১] ফকীহদের একটি দল মনে করেন, মাথার আঘাতের বিপরীতে চেহারার আঘাতে দুগুণ বেশি জরিমানা ধার্য হওয়া উচিত। কেননা, মাথার চেয়ে চেহারার আঘাত বেশি দৃষ্টিকটু। মাথার জখম চুলের দ্বারা আড়াল করা যায় কিন্তু চেহারার আঘাত আড়াল করা যায় না।[৪২] ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. এর মতে মুযিহা'র পর্যায়ভুক্ত আঘাত চেহারায় হোক আর মাথায় হোক তাতে নির্দিষ্ট জরিমানার চেয়ে বেশি সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মালিক র. এর বহুল আলোচিত মত হলো, মাথা কিংবা চেহারার জখম ভরাট হওয়ার পরও যদি দৃষ্টিকটু দেখায় তাহলে দৃষ্টিকটু হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট জরিমানা ছাড়াও ন্যায়সংগত অতিরিক্ত জরিমানা আদায় করা যাবে।[৪৩]

২. হাশিমা (যে আঘাতে হাড় ভেঙে গেলেও যথাস্থানে বহাল থাকে) পর্যায়ভুক্ত আঘাতে দুটি জরিমানা ধার্য হয়। হাশিয়ায় দশ উট জরিমানার বিষয়টি রসূল স. এর সরাসরি কোন হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে এই পরিমাণ নির্ধারিত। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, এই পর্যায়ের জখমের সম্পর্ক

মাথা ও চেহারার সাথে। ইমাম মালিক র. বলেন, মাথা ও চোহারা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংগের জখমও হাশিমার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিক র. বলেন, মাথা ও চেহারার আঘাতকে বলা হবে মুন-ফালাহ্।[৪৪]

৩. মুনকালাহ (যে জখমে হাড় ভেঙে স্থানচ্যুত হয়ে যায়) জরিমানার পরিমাণ পনেরোটি উট। আমর ইবনে হাযম রা. এর চিঠিতে নবী করীম স. থেকে এ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে।

৪. আম্মা (যে আঘাত মগজের পর্দা পর্যন্ত পৌছে যায়) তে তিন ভাগের একভাগ ১/৩ দিয়্যত ওয়াজিব হয়। এটির দলীলও আমর ইবনে হাযম রা. এর চিঠি। ইকরামা বিন খালিদ রা. বর্ণিত, নবী করীম স. আম্মা পর্যায়ভুক্ত আঘাতে পূর্ণ দিয়্যতের ১/৩ এক তৃতীয়াংশ জরিমানার ফয়সালা দিয়েছেন।[৪৫]

৫. দামিগায় (যে আঘাত মগজ পর্যন্ত পৌছে যায়) দিয়্যতের অর্ধেক জরিমানা প্রযোজ্য। শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীদের অনেকেই বলেন, যে জখম মগজের পর্দা পর্যন্ত পৌছে যায়) অর্থাৎ আম্মা পর্যায়ের তাতে অর্ধেক দিয়্যত ওয়াজিব।[৪৬] তা থেকে যে জখম বেশি তাতে ন্যায়সংগত জরিমানা ধার্য হওয়া উচিত। কেননা দামিআতে আম্মার চেয়ে আঘাত বেশি গভীর হয়, অনেক সময় তাতে পর্দা কেটে যায়।[৪৭]

স্মর্তব্য ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে মুযিহাহ্ হাশিমা মুনকালাহ এবং আম্মাহ পর্যায়ের আঘাত যদি এমন হয় যে, চেহারা থেকে দাগের চিহ্ন মুছে যায়, তাহলে তাতে কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, তাতে ন্যায়সংগত অনির্ধারিত জরিমানা ধার্য হবে। এবং ইমাম মুহাম্মদ র. আঘাতের চিহ্ন না হলে শুধু চিকিৎসার খরচাদি দেয়ার পক্ষে।[৪৮]

গ্রন্থপঞ্জি

১. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৫। তাতে লেখা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার উপর কৃত অপরাধের প্রতিশোধ স্বরূপ শুধু অপরাধীর অংগ কর্তনের অধিকারীই নয়, কিসাস নেয়া না নেয়া এবং অংগ নির্বাচনের অধিকারও তার রয়েছে। অবশ্য সবচেয়ে ভালো দিক হলো প্রতিশোধ না নিয়ে অপরাধীকে মাফ করে দেয়া। কারণ ক্ষমার চেয়ে মহোত্তম আর কিছু নেই। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা ২২১।

২. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২১২। তাতে লেখা হয়েছে, দিয়্যত বা জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যে অপরাধ ভুলবশত হয়েছে একই অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটতো তাহলে অপরাধীর উপর কিসাস ওয়াজিব হতো। যেসব অপরাধ ইচ্ছাকৃত ঘটলেও কিসাস কার্যকরি হয় না, সেগুলো ইচ্ছাকৃত হোক আর ভুলবশত হোক তাতে কোন হেরফের ঘটে না। আলআহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা ২২১, আরো দেখুন ইবনে হাযম আলমুহাল্লা খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৪০৩।

৩. আলবাদায়ে আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০১। তাতে বলা হয়েছে, দিয়্যত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, কোন অংগের কার্যকারিতা ও উপকারিতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা দু'ভাবেই হতে পারে, অংগটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিংবা অংগ যথাস্থানে বহাল থাকলেও তার কার্যকারিতার বিলুপ্তি ঘটা।

৪. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১১, ৩১২, তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২৯, হাশিয়া আদদাসুকী খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৯৬।

৫. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১১। তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২৯, আল আহকামুস-সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী, পৃষ্ঠা ২১১/২১২।

৬. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১১, হাশিয়া আদদাসুকী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ২৯৬।

৭. আলবাদায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১১।

৮. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৪। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আলকানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২৯। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা ২১১, ২২২।

৯. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২২।

১০. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৪। তাতে বলা হয়েছে, অঙ্গ যদি সম্পূর্ণ কেটে যায় কিংবা অংগ যথাস্থানে বহাল থাকলেও এর কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় এমন উভয় অবস্থায় বিধান একই। অর্থাৎ পূর্ণ দিয়্যত দিতে হবে।

১১. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১১-৩১৪। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আলকানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২৯।

১২. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৪। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২৯।

১৩. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৪। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১২৯/১৩১।

১৪. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৪, তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১২৯/১৩১।

১৫. আলবাদায়ে আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৫। তাতে বর্ণিত হয়েছে, অপরাধী কাউকে প্রহার করল, তাতে সেই ব্যক্তির সকল দাঁত পড়ে গেল। এতে পূর্ণ দিয়্যতের সাথে আরো ৩/৫ তিন পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত দিয়্যত দিতে হবে। কেননা সাধারণত দাঁত ৩২টি থাকে।

১৬. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৪।

১৭. আলবাদায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৩। তাতে বর্ণিত হয়েছে, নিয়ম হলো, হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের যেসব অপরাধে কিসাস ও সুনির্দিষ্ট জরিমানার বিধান নেই, তাতে ন্যায়সংগত ফয়সালা করতে হবে। কারণ আইনের মূলসূত্র হলো, নিরপরাধ একজন

মজলুম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যথাসম্ভব ক্ষয়ক্ষতির ভর্তুকি দেয়া উচিত এবং অপরাধীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার অপরাধ কর্মের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি ও নিশ্চিত করা জরুরী। যাতে সে অপরাধ কর্মে উৎসাহিত না হয়।

১৮. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৪/৩২৫। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আলকানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩৩। আশ শারহুল কবীর খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৩৭। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা পৃষ্ঠা ২৬২। তাতে তিনি লিখেছেন, অনির্দিষ্ট জরিমানা হলো, বিচারক তার সুবিবেচনা প্রসূত স্থির দেবেন। বিচারক বিষয়টি একটি নিখুঁত গোলামের সাথে তুলনা করবেন ত্রুটিপূর্ণ গোলামের বিপরীতে এর মূল্য কি হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় তুলনা করার পর দুটির মধ্যে মূল্যের যে পার্থক্য হবে সেটিই হবে উল্লেখিত ক্ষতির জরিমানা। আততাজ ওয়াল আকলী আল মুখতাসার আল খলীল। খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৫৮। এই কিতাবটি মাওয়াহিবুল জলীল এর হাশিয়াতে ছাপা হয়েছে।

১৯. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০২। তাতে লেখা হয়েছে, সে যদি অর্ধেক কেটে ফেলে থাকে তবে তাতে কিসাস সাব্যস্ত হবে না। কারণ জোড়ার অর্ধেকে কাটা পড়লে এর বিপরীতে পূর্ণ জোড়ার কিসাস নেয়া যাবে না। এমতাবস্থায় তাতে ন্যায়সংগত জরিমানা সাব্যস্ত হবে, কারণ তাতে জরিমানা নির্দিষ্ট নেই।

২০. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৩। সাধারণত যে কোন হাড় ভেঙে গেলে তাতে অনির্দিষ্ট জরিমানা সাব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে দাঁতের বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা, কোন হাড়ের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব নয়। বস্তুত শরীয়ত এক্ষেত্রে কোন জরিমানা নির্দিষ্ট করে দেয়নি।

২১. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৩। তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানয ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ১৩৪। আসসুরাখসী, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ১৬৬/১৬৭। আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ২৬২।

২২. আলবাদায়ে, আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৩। বোবার জিহ্বা কর্তনে ন্যায়সংগত জরিমানা দিতে হবে। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ২৬২।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. প্রাগুক্ত। তাতে আরো লেখা হয়েছে, অচল হাত পা কর্তনের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত জরিমানা ধার্য করতে হবে।

২৫. আলবাদায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৩। তাতে বলা হয়েছে, প্রজনন ক্ষমতা রহিতকৃত পুরুষ ও যৌন সঙ্গমে অক্ষম পুরুষের প্রজনন লিঙ্গ কর্তনের অপরাধেও নির্দিষ্ট জরিমানার বিধান নেই। তাতেও বিচারক বিচার বিশ্লেষণ করে ন্যায়সংগত জরিমানা নির্ধারণ করবেন। যেহেতু এই অংগের দ্বারা সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, এজন্যে এর বাহ্যিক অবয়বের তেমন কোন তাৎপর্যগত মূল্য নেই।

২৬. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯৬। এতে বর্ণিত হয়েছে, শাজাজ বা শাজ্জাহ মাথা বা চেহারার হাড় সর্বস্ব জায়গার আঘাতকে বলা হয়। যেমন, কপাল, গণ্ড, কানপট্টি, থুতনী, চাপা। আম্মা

বলা হয় এমন আঘাতকে যা মাথার মগজ পর্যন্ত চলে যায়। প্রায় সকল ফকীহ্গণের একই মত। অবশ্য কোন কোন ফকীহ্ বলেন, উল্লেখিত জখমের বিধান শরীরের অন্যান্য জখমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩২। তাতে বলা হয়েছে, শাজাজ শব্দ মাথা ও চেহারার জখম বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য জখম বোঝানোর জন্যে আরবীতে 'জারাহ্' শব্দ প্রয়োগ করা হয়।' 'আশশারহুল কাবীর খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬১৯ এ লেখা হয়েছে, শাজ্জাহ' শুধুই মাথা ও চেহারার জখম অর্থে ব্যবহৃত হয়।' নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯। উল্লেখিত মতামতে মাথা ও চেহারার আঘাতকে শাজ্জাহ্ বলা হয় যদিও শাজ্জাহ্ শব্দ শরীরের অন্যান্য জখমের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২৭. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯৬। তাতে লেখা হয়েছে, শাজ্জাহ ১১ (এগারো) প্রকার। ইমাম মুহাম্মদ র. এর সংখ্যা ৯ (নয়টি) বলেছেন। তিনি 'হারেসা' ও দামেগার উল্লেখ করেননি। তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ১৩২। তাতে লেখা হয়েছে, শাজাজের প্রকরণে উম্মাহর পর এক প্রকার জখমের উল্লেখ করা হয় যাকে দামিগা বলা হয়। ইমাম মালিক র. এই প্রকার দুটির উল্লেখ করেননি।

২৮. আততাজ আল আকলীল মুখতার আলখলীল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৫/২৪৭, হাশিয়া আদদাসুকী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৯৩। আশশারহুল কাবীর খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬১৯।

২৯. আলমুহায্যাব খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১২। নিহায়তুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯। কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল আকনা, খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ১৩৮৫। আশশারহুল কাবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬১৯। এটি আল মুগনীর সাথেই ছাপা হয়েছে। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ২৬১।

৩০. 'শাজ্জাহ' শব্দ ও এর মর্মার্থ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্যে দেখুন, তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩২। নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল নিহাজ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯/৩০। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ২৬১/২৬২। আশশারহুল কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬১৯, আততাজ ওয়াল আকলীল, মুখতাসার আল খলীল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৬/২৪৭।

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. তাবঈনুল হাকায়েক, শরহুল কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩৩। আততাজ ওয়াল আকলীল, মুখতাসার আল খলীল খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৬/২৪৭। এটি মাওয়াহিবুল জলীল এর হাশিয়ায় ছাপা হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, মাথা ও চেহারায় মুযিহাহ পর্যায়ের আঘাতে কিসাস নেই। অবশ্য মুনকালাহ্ এর কিসাসের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা রয়েছে। বহুল আলোচিত মতামত হলো, 'ইমাম মালিক র. এর মতে হাড়ের আঘাতে কিসাস কার্যকরি হবে। যদি না

এক্ষেত্রে ঝুঁকি আশংকাজনক পর্যায়ে থাকে।' আলমুহাযযাব, শিরাজী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯০। আরো দেখা যেতে পারে, আলমুহাল্লা, ইবনে হাযম, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৪৬১। তাতে লেখা হয়েছে, অনেকেই মনে করেন, ইচ্ছাকৃত জখমের অপরাধে মুযিহাহ ছাড়া শাজাজ এর অন্য প্রকারগুলোতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। তারা বলেন, এসব জখমে সমতা রক্ষা করে শাস্তি দেয়া অসম্ভব। এ কথা উদ্ধৃত করার পর ইবনে হাযম বলেন, সঠিক কথা হলো, সব ধরনের শাজাজেই কিসাস কার্যকরি হবে। মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, 'যার পবিত্রতা অলংঘনীয় তার অবমাননা করলে সবাইকে এর জন্যে কিসাস ভোগ করতে হবে। কেউ যদি তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।' (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৩) বর্ণিত আয়াতে বিশেষ কোন ধরনের আক্রমণকে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

৩৩. আততাজ ওয়াল আকলীল, মুখতাসার আল খলীল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৬।

৩৪. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৯।

৩৫. তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আল কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩৩। তাতে লেখা হয়েছে, জাহিরে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মুযিহাহর চেয়ে নিম্নের জখমেও কিসাস কার্যকরি হবে। ইমাম মুহাম্মদ র. 'আসল' গ্রন্থে তাই লিখেছেন। এটা বিশুদ্ধ। কেননা সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিশোধ তাতেই কেবল নেয়া সম্ভব।

৩৬. আল মুহাযযাব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯০। নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০। তাতে বলা হয়েছে, শুধু মুযিহাহয়, কিসাস ওয়াজিব। কারণ এটার অবস্থান নির্দিষ্ট এবং এর সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব। এছাড়া অন্যান্য জখমের অবস্থা এমন নয়। কেউ কেউ বলেন, মুযিহাহ ও এর ক্রমধারায় এর পূর্বের জখমগুলোতে কিসাসের বিধান কার্যকর। কারণ মুযিহাহ-এর পরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারা এগুলোর পরিমাপ নির্ধারণ করা সম্ভব। এই যুক্তির জবাবে বলা হয়েছে, শুধু এই সম্ভাবনার দ্বারা আংশিক কিসাস কার্যকরি হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কারণ উল্লেখিত সম্ভাবনার দ্বারা শুধু এতটুকুই সাব্যস্ত হয়, মুযিহাহ যে ধরনের জরিমানা সাব্যস্ত হয় সেগুলোতেও অনুরূপ জরিমানা সাব্যস্ত হবে। মুযিহাহ এর আগে বর্ণিত হারিসাতেও জরিমানা নেই। কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল আকনা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৫/৩৮৬, আশশারহুল কবীর খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪৬১।

৩৭. আলমুহাযযাব, শিরাজী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯০, আশশরহুল কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬১৯।

৩৮. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২২।

৩৯. তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আল কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩৩। তাতে লেখা হয়েছে, হারেসা, দামিআ, দামিয়াহ, বাদিআহ, মুতালাহিমা ও সামাহাকের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত জরিমানা ধার্য হবে। কেননা এগুলোতে নির্দিষ্ট জরিমানা নেই। সেই সাথে এসব অপরাধকে কোন প্রতিকারহীন অবস্থায়ও ছেড়ে দেয়া সমীচীন নয়। এটা ইবরাহীম নাখঈ র. ও উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. এর অভিমত। আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৪।

৪০. আশশারহুল কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬১৯।

৪১. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬। তাতে লেখা হয়েছে, মুযিহাহ যদি ভরাট হয়ে যায় আর সেটির দাগ অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে ৫টি উট জরিমানা দিতে হবে। এ ব্যাপারে রসূল স. এর বর্ণনা রয়েছে। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩২/১৩৩। তাতে লেখা হয়েছে, মুযিহায় পূর্ণ দিয়্যতের ১/২০ ওয়াজিব হয়।

৪২. আশশারহুল কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬২১।

৪৩. মাওয়াহিবুল জালীল, শরহে মুখতাসার খলীল খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৫৯। তাতে বলা হয়েছে, মুযিহাহ জখম যদি ভরাট হয়ে যায়, এবং এর দাগ দৃষ্টিকটু ও অমর্যাদাকর হয় তবে এ ব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে। ইমাম মালিক র. ও ইবনে কাসিম র. এর বহুল প্রচারিত মতামত হলো, আহত ব্যক্তির জন্যে আঘাতের চিহ্ন যে পরিমাণ কদর্য ও অমর্যাদার কারণ হবে সেই অনুযায়ী যৌক্তিক জরিমানা ধার্য করা হবে।

৪৪. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬। তাতে লেখা হয়েছে, জখম যদি ভরাট হয়ে যায় এবং এর চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তবে হাশিমাতে ১/১০ এক দশমাংশ দিয়্যত ওয়াজিব হবে। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আল কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা, ১৩২/১৩৩। হাশিমার আঘাতে ১/১০ এক দশমাংশ দিয়্যত দিতে হবে। আলমুহাযযাব, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২১৩। আশশারহুল কবীর, খণ্ড ৯৯, পৃষ্ঠা ৬২৫, ৬২৬।

৪৫. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬। জখম যদি ভরাট হয়ে যায় এবং এর চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তবে মুনকালাহ জখমে ১৫টি উট জরিমানা হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ প্রসঙ্গে রসূল স.-এর নির্দেশ রয়েছে। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩২/১৩৩। মুনকালাতে দিয়্যতের এক দশমাংশ সেই সাথে আরো ১/২০ এক বিংশতাংশ সাব্যস্ত হবে।

৪৬. আল কাসানী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩১৬। জখম যদি ভরাট হয়ে যায় এবং দাগ অবশিষ্ট থাকে তাহলে আম্মায় ১/৩ এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব, আলমুহাযযাব খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৩। আশশারহুল কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬২৭/৬২৮।

৪৭. আলবাদায়ে, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬, আলমুহাযযাব খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৩। আশশারহুল কবীর খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬২৮।

৪৮. আল কাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬।

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ৯৬-১০৬

কুরআনের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান-দর্শন

মেহ্‌দী গুলশানী

বিজ্ঞান বলতে আমরা জ্ঞানের সে শাখাকেই বুঝি যা জড়-বিশ্ব নিয়ে চর্চা করে। বিজ্ঞানের দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত দার্শনিক সমস্যা নিয়ে চর্চা করে। এখানে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো হচ্ছে ঃ

১. কিভাবে আমাদের জড়-বিশ্বের জ্ঞান প্রসার লাভ করে?

২. Unswelying বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূলনীতিগুলো কি?

এ দুটো সমস্যাকে আমরা কুরআনের দৃষ্টি থেকে আলোচনার ইচ্ছা করছি।

কুরআনের দৃষ্টিতে Epistemological সমস্যাসমূহ

কুরআনের দৃষ্টিতে আমাদের মনে প্রকৃত বিশ্বের একটি ধারণা আছে ঃ

'বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধবান করবে না?' (৫১ ঃ ২০-২১)

'সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব ঘটিয়েছেন।' (৬ ঃ ১)

'তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বস্তুসামগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? বস্তুত এরপর কিসের উপর ঈমান আনবে?' (৭ ঃ ১৮৫)

এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আমাদের আদেশ করা হয়েছে জড় পৃথিবী (নিদর্শন ও প্রকৃতি) সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানালোচনা করার জন্য এবং সেসব সুযোগ ব্যবহার করার জন্য যেগুলো তিনি আমাদের জন্য তৈরি করেছেন ঃ

'তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমূহ ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতি প্রদর্শনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না।' (১০ ঃ ১১)

'আল্লাহ যিনি উর্ধদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন।

প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা নিজেদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।' (১৩ ঃ ২)

'তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। নিশ্চয় এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যেসব রং-বেরংয়ের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাছ খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় রত্ন অলঙ্কার। তোমরা তাতে নৌযান-সমূহকে পানি চিরে অগ্রসর হতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার কর।' (১৬ ঃ ১২-১৪)

যদি প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সম্ভবপর না হতো তবে কুরআন আমাদের সৃষ্টির উৎপত্তি ও বিবর্তন ধারা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সুপারিশ করতো না। তদুপরি কুরআনে এমন আয়াতসমূহ রয়েছে যা এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে দিকনির্দেশ দান করে ঃ

'এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে ওঠবে যে, এ কুরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?' (৪১ ঃ ৫৩)

অন্যদিকে কুরআন সকল মানুষের জন্য পথনির্দেশক গ্রন্থ এবং মানব জীবনের আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়কে উপেক্ষা করেনি ঃ

'সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত করব। আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।' (১৬ ঃ ৮৯)

'এ গ্রন্থে আমি কোন কিছুই উপেক্ষা করিনি।' (৬ ঃ ৩৮)

অতএব আমরা আশা করি যে, সচেতনভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে যে কেউ এ কিতাব থেকে প্রকৃতি চর্চার সঠিক পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে।

প্রকৃতি সম্পর্কে জানার পদ্ধতি

কুরআনের মতে প্রকৃতি পাঠের জন্য সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের বিবেক ও বুদ্ধি ঃ

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।' (১৬ ঃ ৭৮)

আমরা দর্শন ও প্রতিফলনের অনুসারী পরীক্ষণের মাধ্যমে শিখে থাকি ঃ

'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন।' (২৯ ঃ ২০)

'তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি– যাতে তারা সমঝদার হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে? (২২ ঃ ৪৬)

এ আয়াতসমূহের প্রথম অংশগুলো দর্শন ও পরীক্ষণের জন্য নির্দেশ দেয়। দ্বিতীয় অংশ কারণ অনুসন্ধানের মনোবৃত্তি যোগায়। এভাবে পরীক্ষামূলক কর্ম হচ্ছে প্রকৃতিকে বোঝার একটি অপরিহার্য পদ্ধতি। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে, কিছু বুদ্ধিজীবী অভিযোগ করেন, প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সকল তথ্য সরাসরি অনুভূতি থেকে উৎসারিত নয়। যদি আমরা আমাদেরকে অনুভূতির মধ্যে বন্দী করে রাখি এবং আমাদের মেধা ব্যবহার না করি, তবে আমরা পশুদের চাইতে উত্তম বলে বিবেচিত হব না ঃ

'....তাদের অন্তর রয়েছে, তা দিয়ে বিবেচনা করে না; তাদের চোখ রয়েছে, তা দিয়ে দেখে না; আর তাদের কান রয়েছে, তা দিয়ে শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল অমনোযোগী।' (৭ ঃ ১৭৯)

তদুপরি কুরআন প্রায়ই বলে যে, প্রকৃতিতে অবস্থিত ইলাহী চিহ্নাদি সেই মানুষদের পক্ষেই পাওয়া সম্ভব যারা বুদ্ধি ও গভীর চিন্তার অধিকারী ঃ

'নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে।' (৩ ঃ ১৯০-১৯১)

'নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করছেন, তা দ্বারা মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবকরম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে– নিশ্চয় সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।' (২ ঃ ১৬৪)

কুরআন আমাদেরকে এ থেকে শিক্ষা দেয় যে, জড় বিশ্বে এমন অনেক বাস্তবতা আছে যা আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আয়ত্ব করতে পারছি না ঃ

'তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি এবং তোমরা যা দেখ না– তার।' (৬৯ ঃ ৩৮-৩৯)

'তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন– তোমরা তা দেখছ।' (৩১ ঃ ১০)

মূলত কুরআন তাদেরকে বাতিল ঘোষণা করে যারা মনে করে, জড় বিশ্বের ব্যাপারে আমাদের তথ্যের কেবলমাত্র সূত্র হচ্ছে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান।

'আপনার নিকট আহলে কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব নাযিল করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুত এরা মূসার কাছে এর চেয়ে গুরুতর দাবি পেশ করেছিল। বলছিল, একেবারে সরাসরি আমাদের আল্লাহকে দেখাও। অতএব তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন।' (৪ ঃ ১৫৩)

দুর্ভাগ্যবশত এ শতাব্দীর (গত শতাব্দীর) প্রথমাংশে দৃষ্টবাদ-এর যে বাতাস বয়েছিল তা অনেক মুসলিম পণ্ডিতের মনকে প্রভাবিত করেছিল এবং অনেক মুসলিম বিজ্ঞানী এমনও আছেন যারা ভাবেন, জড়বিশ্বের জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অভিজ্ঞতার চাইতে বেশি দূর সম্প্রসারিত হয় না। এ ধরনের চিন্তার সূত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ ঃ

১. আমরা কখনো পরিষ্কার মন নিয়ে প্রকৃতির মুখোমুখি হই না, ফলে পরীক্ষণ তথ্যের মত সঠিক কিছু পাই না। পরীক্ষণ-তথ্যের আমাদের বিশদ ব্যাখ্যা এবং পরীক্ষণ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গবেষকদের পূর্বধারণা ও অনুমানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। PLANK বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

প্রতিটি পরিমাপ জড়বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত ভাবের মাধ্যমে এর প্রথম অর্থ সংগ্রহ করে যা একটি মতবাদ থেকে উৎসারিত। যার একটি মানসম্পন্ন বিজ্ঞান গবেষণাগার আছে তিনি স্বীকার করবেন যে, সুন্দরতম এবং সরাসরি পরিমাপটিও– যেমন ওজন এবং স্রোত বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই পুনঃ পুনঃ সংশোধন করতে হবে। এটা সুস্পষ্ট যে, এই সংশোধনী পরিমাপ পদ্ধতির নিজের পরামর্শমত হতে পারে না। পরিস্থিতির উপর কিছু মতবাদ বা অন্য কিছুর আলোকে এটা প্রথমেই আবিষ্কৃত হতে হবে। বলা যায়, এগুলো কল্পনা থেকে আসতে পারে।

২. বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন যেরকম সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন যে, মৌলিক ধারণা এবং বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধতা কোন আরোহ পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করা যেতে পারে না। বরং এগুলো মানব মনের স্বাধীন আবিষ্কার।[২]

পদার্থবিজ্ঞান বিবর্তন ধারার একটি যৌক্তিক পদ্ধতি ধারণ করে যার ভিত্তিকে উড়িয়ে দেয়া যাবে না যেমন ছিল অবরোহণ পদ্ধতির অভিজ্ঞতা, কিন্তু স্বাধীন আবিষ্কারের মাধ্যমে সেখানে উপনীত হওয়া যাবে। উক্ত পদ্ধতির সঠিকত্ব ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উক্তির বৈচিত্র থেকে অর্জিত হয়।

'আমি তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম পৌছিয়েছি কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মে নিস্পৃহ।' (৪৩ ঃ ৭৮)

'অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। তারা অন্যায় ও অহঙ্কার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল; যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।' (২৭ ঃ ১৩-১৪)

৩. পূর্বপুরুষ ও দায়িত্বশীলদের অন্ধ অনুকরণ

'তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।' (৩৩ ঃ ৬৭)

'......না আমরা সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, অনুসরণ করত না সরল পথও।' (২ ঃ ১৭০)

৪. অকারণ অস্বীকৃতি এবং সমর্থন

বিচারে ভুল হওয়ার একটি প্রধান সূত্র হচ্ছে অনুমান ভিত্তিক জ্ঞান উপস্থাপন করা ঃ

'অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়।' (৫৩ ঃ ২৮)

বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে, কারণ ছাড়া কেউ কিছু গ্রহণ বা বাতিল করতে পারবে না ঃ

'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।' (১৭ ঃ ৩৬)

বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি প্রাচীন মূলনীতি

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও পরীক্ষা কার্যের এক সুসমন্বয়। এ চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এবং সঠিক ফল পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে কাউকে যে কোন বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের কিছু প্রাচীন মূলনীতি অনুসরণ করতে হয়। এমন মূলনীতির প্রকার ও ব্যাখ্যার ভিন্নতা আছে। আমাদের মনে হয় কুরআনকে নিজেদের দিকনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করলে, সাথে যুক্তিবিজ্ঞানের মূলনীতিকে রেখে (অর্থাৎ বিরুদ্ধহীনতার মূলনীতি) যে কেউ নিচের প্রাচীন মূলনীতিগুলোকে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের জন্য গ্রহণ করতে পারে।

১.একত্ববাদের মূলনীতি (তাওহীদ)

কুরআনের দৃষ্টিতে কারো নিজের অনুসন্ধিৎসার স্বার্থে প্রকৃতি-চর্চা করা যাবে না। এটা মহামহিম সৃষ্টিকর্তা ও মহাবিশ্বের পরিচালকের সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। সকল প্রাকৃতিক সৃষ্টি মহাশক্তিধরের নিদর্শন এবং তাদের ব্যাপারে যে কোন গবেষণা আমাদেরকে তাঁর কাছেই নিয়ে যাবে।

তদুপরি পবিত্র কুরআনে আদেশ, ঐক্য, জড়বিশ্বের উপস্থিতি সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে :

'তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে।' (২৫ ঃ ২)

'তুমি করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি?' (৬৭ ঃ ৩)

'আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।' (৪৪ ঃ ৩৮-৩৯)

এই মহাজাগতিক আদেশ এবং সমন্বয় মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও সমন্বয়কারীর আরোপিত ঃ

'যদি নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য থাকত তবে উভয়ের ধ্বংস সাধিত হতো।' (২১ ঃ ২২)

'এটা আল্লাহর কারিগরি– যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত।' (২৭ ঃ ৮৮)

'এরা কি কুরআনের প্রতি লক্ষ করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো পক্ষ থেকে হতো তবে তারা এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেতো। (৪ ঃ ৮২)

'তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে, অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে তোমরা জানতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ সেই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে।' (১০ ঃ ৫)

একত্ববাদের মূলনীতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস গবেষক-পণ্ডিতকে প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন কোন অংশ এবং জড় বিশ্বের শৃঙ্খলা ও ঐক্যের বদলে সামগ্রিক দিকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সমর্থ করে।

অন্যদিকে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতিরেকে প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের উপস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কোন স্বতসিদ্ধ মূল্যমান বহন করবে না এবং শেষফল হিসেবে তা অস্থায়ী মান পাবে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক একত্ববাদের মূলনীতির প্রতি বিশ্বাস বা মনোযোগ না দিয়ে প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের ব্যাপারে বিশ্বাস করেন; কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তাওহীদের বিশ্বাস ছাড়া মহাজাগতিক শৃঙ্খলার জন্য অন্য কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই।

২. বহির্বিশ্বের বাস্তবতা

আমরা পূর্বেই বলেছি, কুরআনের দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাইরে একটি বাস্তব বহির্বিশ্ব রয়েছে ঃ

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন।' (১৬ ঃ ৭৮)

'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারো এবং যিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্য যানবাহনে পরিণত করছেন।' (৪৩ ঃ ১০, ১২)

দৃশ্যমান জগতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সকল জড় এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। এ বিশ্বাস ছাড়া যে কোন বৈজ্ঞানিক সাধনা ব্যর্থ ও খেলাধুলায় পরিণত হবে। বৈজ্ঞানিকদের কর্মকাণ্ডে এ বিশ্বাস সব সময় শক্তিশালী উজ্জীবক। প্লাঙ্ক এ বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

পছন্দনীয় এবং অতি সহজাত মনগুলো এবং ক্যাপলার, নিউটন, লিবনিজ ও ফ্যারাডের মত মানুষ বহির্বিশ্বের বাস্তবতার বিশ্বাসে এবং উচ্চ কারণের আদর্শ ও তার বাইরের কিছু বিষয়েও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

৩. মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

আমরা কুরআন থেকে শিখে থাকি যে, মানবজ্ঞান সীমাবদ্ধ।

'এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।' (১৭ ঃ ৮৫)

এমন অনেক বিষয়ই আছে যা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় অনুধাবন করতে পারে না ঃ

'তোমরা যা দেখ আমি তার শপথ করছি এবং যা তোমরা দেখ না তারও।' (৬৯ ঃ ৩৮-৩৯)

'আল্লাহ যিনি উর্ধদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা তা দেখছো' (১৩ ঃ ২)।

'পবিত্র ও মহান তিনি যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন করেন উদ্ভিদকে এবং তাদের বিভিন্ন প্রকারকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।' (৩৬ ঃ ৩৬)

এবং আমাদেরকে অবশ্যই না দেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস করতে হবে অর্থাৎ অতি প্রাকৃত সত্যের উপর ঃ

'এটা সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।' (২ ঃ ২-৩)

মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার উপর এবং অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস আমাদের জন্য একটি উত্তেজক বিষয় যাতে আমাদের মন জ্ঞানার্জন অবস্থায় বন্ধ হয়ে না যায় এবং তা এমন চিন্তা না করে যে, আমরা সবকিছু আবিষ্কার করে ফেলেছি।

কারণতত্ত্বের মূলনীতি

এই মূলনীতি বলে যে, প্রতিটি ঘটনার একটি কারণ রয়েছে। এই মূলনীতির দুটো গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত আছে ঃ

১. অদৃষ্টবাদের মূলনীতি ঃ যে কোন কারণের কর্মফল থাকে, কারণ ছাড়াও ফলাফল থাকে এবং কারণ ছাড়া কোন কর্মফল থাকা অসম্ভব।

২. প্রকৃতির সমরূপতার মূলনীতি ঃ একই ধরনের কারণের ফলস্বরূপ একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়।

বহু দিনের বহু সময়ের বহু বৈজ্ঞানিকের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা যে, জড় জগত পরিচালনা করার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। কারণতত্ত্বের মূলনীতি স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের উপর ব্যবহৃত যে কোন আইনের প্রয়োগ এর অর্থ প্রদান করে।

পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে আমরা উদ্ধৃতি পেয়ে থাকি। বিশ্বে আল্লাহর অপরিবর্তনীয় পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে ঃ

'তারা কি কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না।' (৩৫ ঃ ৪৩)

'এটাই আল্লাহর প্রকৃতি যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।' (৩০ ঃ ৩০)

এমন আরো আয়াত রয়েছে যেগুলোতে বিশেষ ঘটনাসমূহের সংঘটিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট কৌশল বর্ণিত হয়েছে ঃ

'আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। (২৩ ঃ ১২) আর যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন।' (২ ঃ ২২)

কুরআনের কিছু আয়াত অন্যদের উপস্থিতিতে কিছু ঘটনার অন্তর্নিহিত নীতির বিশ্লেষণ করে ঃ
'তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি যারা তাদের উপর পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল।' (১০৫ ঃ ৩-৪)
'যুদ্ধ কর ওদের বিরুদ্ধে; আল্লাহ তোমাদের দ্বারা তাদের শাস্তি দেবেন।' (৯ ঃ ১৪)
অপরপক্ষে কুরআনের আরো কিছু আয়াত রয়েছে যা সৃষ্টিকে উপস্থাপন করে এবং পৃথিবীর দিকে আল্লাহর দিকনির্দেশ করে ঃ
'বলুন, আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা।' (১৩ ঃ ১৬)
'শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।' (৭ ঃ ৫৪)
উক্ত একজোড়া আয়াতকে একত্রে রাখলে যে কেউ এ সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে, সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়, কিন্তু বিশেষ খাত ধরে। নিম্ন ধরনের আয়াতগুলো এ বক্তব্যকে নিশ্চিত করে ঃ
'এবং উৎকৃষ্ট ভূমি' তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্যে।' (৭ ঃ ৫৮)
এই আয়াত নির্দেশ করে যে, বৃক্ষ চারার জন্মের জন্য যদিও আল্লাহর ইচ্ছার প্রয়োজন, তবুও ভূমির উর্বরতাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন ধরনের চারা যে কোন ধরনের ভূমিতে উদ্গাত করানো যাবে না।
আশ'আরিয়া মতবাদের কতিপয় বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ (যেমন ইমাম গাযালী এবং ইমাম রাজী) জড় জগতের কারণের সম্পর্ককে বাতিল ঘোষণা করে বলেন, জড় বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বস্তুসমূহের উপলব্ধিতে কোন ভূমিকা না থাকা। যে কোন ঘটনার কারণ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা, তা ব্যতীত যা আল্লাহর সৃষ্টি করার অভ্যাস যাকে আমরা বলি ফলাফল, পরে বলি কারণ, এদের মাঝে কোন সম্পর্ক ছাড়াই যা ফলাফলকে কারণ অনুসরণে অত্যাবশ্যক করে। যদি আল্লাহ তা না চান তবে তথাকথিত ফলাফল তথাকথিত কারণকে অনুসরণ করবে না।৪
এ কারণে উক্ত ধর্মতত্ত্ববিদগণ অদৃষ্টবাদকে অস্বীকার করেন। তারা মনে করেন প্রয়োজনীয় কারণগত সম্পর্ককে সত্য বলে ধরে নিলে আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হবে এবং অলৌকিকতা বলতে কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। এ সিদ্ধান্ত যেহেতু সঠিক নয়, কারণ যাকে সাধারণত কারণ বলা হয় তা হচ্ছে মোটামুটি মাধ্যম বা কারণ তৈরির উপাদান, এটা উপযুক্ত কারণ হিসেবে গণ্য নয়। 'প্রতিনিধির ভূমিকা বলতে বোঝায় সকল কিছু সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি করা, কিন্তু তিনি সুনির্দিষ্ট মাধ্যম এবং কারণ তৈরি করে সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং এগুলো নিজেরাই আল্লাহ কর্তৃক সৃজিত। মাধ্যমের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টিকর্তার কোন অভাবজনিত বিষয় নয়, বরং তা আল্লাহর ভাবোচ্ছ্বাস সম্পর্কে গ্রহীতার অভাববোধের সাথে জড়িত।'

পদার্থ বিজ্ঞানে কোয়ান্টাম মতবাদ আবির্ভাবের পর এবং ১৯৩০ সালে ডব্লিউ হাইসেনবার্গ কর্তৃক সন্দেহের মূলনীতি উপস্থাপনার পর এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের কয়েকজন অদৃষ্টবাদের মূলনীতি এবং পারমাণবিক রাজ্যে প্রকৃতির সমরূপতর মূলনীতি অস্বীকার করেন। তাদের দৃষ্টিতে মাইক্রোফিজিক্সের একটি পরিসংখ্যানগত মর্যাদা আছে। তারা অনেকগুলো একজাতীয় পরীক্ষণের গড় টেনে এবং একক পরীক্ষণের ব্যতিক্রম অনুমোদন করে তা তুলে ধরেন।

অধিকাংশ পদার্থবিদ, প্লাঙ্ক এবং আইনস্টাইনের মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের কিছু ব্যতিক্রম বাদে, নতুন মতবাদ গ্রহণ করেন এবং তার গোঁড়া ব্যাখ্যা যার পরিস্থিতি এখনও বিরাজমান, যদিও সময় গড়িয়ে যাওয়ায় বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

আইনস্টাইন, প্লাঙ্ক এবং অন্যান্য বিখ্যাত পদার্থবিদ মহাবিশ্ব পরিচালনার সম্ভাব্যতার আইনটি গ্রহণ করতে পারেননি। তাদের মতে, প্রকৃতির মুহূর্তগুলো নির্দিষ্ট আইনের সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত এবং একটি স্থায়ী ভিত্তি স্পষ্ট পরিসংখ্যানগত আচরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বিধেয়। কেউ সম্ভাব্যতার বিধি ব্যবহার করেন হয়ত। কারণ যে বিধি প্রচলিত আছে তা যথাযথ জানা নেই অথবা বৃহৎ নম্বরগুলোতে হস্তক্ষেপ করার অসুবিধা থাকে।

এ প্রসঙ্গে আইনস্টাইন নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করন ঃ

আমি দোষ স্বীকার না করে পারি না যে, আমি উক্ত ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র সাময়িক গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। বাস্তবতার আদর্শের সম্ভাব্যতার উপর আমি এখনও বিশ্বাস করি, মতবাদটি সম্পর্কে বলা যায় যা নিজেরাই কোন বস্তুকে উপস্থাপন করে এবং শুধুমাত্র তাদের ঘটনার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে করে না।৮

আইনস্টাইন ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে মেক্সবর্নকে লেখা চিঠিতে বলেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্স অবশ্যই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু একটি আন্তকণ্ঠ আমাকে বলছে যে, এটা আসলে প্রকৃত কোন বিষয় নয়। মতবাদটি অনেক কিছুই বলে কিন্তু পুরনো বিষয়টির গোপনীয়তার কাছে প্রকৃতপক্ষে নিয়ে যেতে পারে না। আমি যে কোনভাবে প্রভাবিত হয়েছি যে, তিনি (আল্লাহ) পাশা খেলছেন না।৯

দুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা কজন মুসলমান পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এসেছিলাম যারা কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে তাদের অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে আশআরিয়াদের পরিত্যক্ত মতবাদটি গ্রহণ করেছেন। আমরা নিম্নোক্ত পটভূমিতে এ দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরছি ঃ

ক. আমরা যদি পারমাণবিক ও পরা-পারমাণবিক বিশ্বের কারণতত্ত্বের বৈধতা অস্বীকার করি তবে তা সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে এই মূলনীতিকে বিকৃত করা বোঝাবে। কেননা কারণতত্ত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সম্মিলনের সাথে সম্পর্কিত।

খ. কারণতত্ত্বের মূলনীতি যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে যুক্তি-প্রমাণ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রের মাঝে কোন সম্পর্ক থাকে না, কেননা ক্ষেত্রটি হচ্ছে কারো সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ। কারণতত্ত্বের নীতিমালা ব্যতিরেকে যুক্তির কোন সিদ্ধান্ত হবে না এবং যে কোন ক্ষেত্র থেকে একজন যে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারবে এবং কোন কিছু প্রমাণ করা ও না করার মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না।

এ কারণেই যারা কারণতত্ত্বের নীতিটি খণ্ডন করে অর্থাৎ সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে এ নীতি ব্যবহার করছে। কারণ যদি তারা বিশ্বাস না করে যে, তাদের যুক্তি আমাদের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনবে, তবে তাদের আমাদের সাথে তর্কে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়।১০

গ. শহীদ প্রফেসর মুরতাদা মুতাহারী[১১] এবং শহীদ আয়াতুল্লাহ সদর[১২] চিহ্নিত করেছেন পারমাণবিক রাজ্যের অসম্ভাব্যতার ভবিষ্যদ্বাণী অদৃষ্টবাদ-এর অভাবে নয়, বরং তা পারমাণবিক ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তুর পরিচালনার সিদ্ধান্তমূলক আইন সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার ফল। এটা হয় আমাদের বর্তমান পরীক্ষামূলক বা তাত্ত্বিক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কারণে অথবা আমরা দর্শকের পরিমাপের ফলাফলের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি।

যে কোন ঘটনায় প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে যে, পারমাণবিক রাজ্যের অদৃষ্টবাদ আবিষ্কারের ব্যর্থতা কারণগত সম্পর্ক ধারণ না করার বিষয়টিকে প্রয়োগ করে না এবং আমাদের কোন অধিকার নেই এমন দাবি করার যে, রাজ্যের প্রাসঙ্গিক সকল কিছু আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি।

এক্ষেত্রে ১৯৭৯ সালে ডিরেক যা লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করা উপযুক্ত হবে মনে হয় ঃ

এটা পরিষ্কার মনে হয় যে, বর্তমান কোয়ান্টাম মেকানিক্স পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। আরো কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। এটা এমন প্রচণ্ড যেমন একজন নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে বহরস অরবিট (Bohr's Orbits) থেকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে। একদিন একটি নতুন Relativistic quantum mechanics আবিষ্কৃত হবে যার মাঝে আমরা এই অসীম ঘটনাগুলো আদৌ খুঁজে পাব না। এটা খুবই উত্তম হবে যে, নতুন কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এ আইনস্টাইন যেভাবে চেয়েছিলেন তেমনি অদৃষ্টবাদ উপস্থিত থাকবে। এই অদৃষ্টবাদ-এ আরো কিছু অন্য পূর্ব-ধারণা অতিরিক্ত বলে অন্তর্ভুক্ত হবে যা পদার্থবিদগণ ধারণ করেন এবং যা এখনই পাওয়ার চেষ্টা করার মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

তাই এ পরিস্থিতিতে আমি মনে করি, এটা খুবই সম্ভব অথবা যে কোনভাবে সম্পূর্ণ অসম্ভব, অবশেষে আইনস্টাইন সঠিক হওয়ার জন্য পরিবর্তিত হবেন, এমন কি সাময়িকভাবে পদার্থবিদগণ বহরস-এর সম্ভাব্যতার ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, বিশেষ করে যদি তাদেরকে তাদের সামনে পরীক্ষা দিতে হয়।১৩

সংক্ষেপে কারণতত্ত্বের অস্বীকৃতির মাধ্যমে অন্যের জন্য কিছুই আবশ্যক হবে না এবং যে কিছু থেকে যে কোন কিছু লাভ করা যাবে, তখন বিজ্ঞানের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। বিজ্ঞানকে সকল সংশোধনীসহ কারণতত্ত্বের মূলনীতিগুলো গ্রহণ করতে হবে। অতএব তখনই তার অস্তিত্ব সার্থক হবে।

তথ্যসূত্র

1. Max Planck, The New Science, Greenwich Editions (1959), p. 51.
2. Einstein A Centenary Volume, A. P. French ed., Heinemann (1979), p. 312.
3. Albert Einstein, Ideas and Opinions, trans. Sonja Bargman. New York, Crown Publishers (1954), pp. 322-323.

4. Max Planck, The New Science (1959), p. 250.
5. Abu Hamid al-Ghazali, Tahafut al-falasifah, Cairo, 1972, pp. 239-240.
6. Fakhr al-din al-Razi, al-tafsir al-kabir, vol. 2, pp. 110-111; vol. 14, pp. 193-195; vol. 30, p. 53.
7. Sadr al-Din Shirazi, Asfar, vol. 6, p. 371.
8. Ideas and Opinions by Albert Einstein, p. 276.
9. Einstein, A Centenary Volume, p. 310.
10. Averroes, Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence), trans. S. Van den Bergh, London, Luzac & Co. 1954, pp. 316-319.
11. M. H. Tabatabai, Usul Falsafah. vol. 3, p. 217 (Mutahhari's footnote).
12. M.B. Sadr. Falsafatuna. Dar al-Taaruf, Beirut 1980, pp. 305-309.
13. Some Strangeness in the Proportion, Woolf ed. Addison-Wesley, p. 65.

অনুবাদ : ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ১০৭

ন্যায় বিচারের গুরুত্ব

মুঃ শওকত আলী

১. আল্লাহ তাআলা সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং অন্যায় পাপ নির্লজ্জতা, জুলুম অত্যাচার ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে নছিহত করেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (সূরা নাহল আয়াত ৯০)

২. '....আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি এর প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি তোমাদের মাঝে ইনসাফ করি। আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব, আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমাদের মাঝে কোন ঝগড়া নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং তার নিকটেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (সূরা আসশূরা আয়াত ১৫)

৩. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে তার ফলে ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর। বস্তুত আল্লাহ ভীতির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল রয়েছেন। (সূরা আল মায়েদা আয়াত ৮)

৪. আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সে সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা ....

.... ফোন/মোবাইল: ....

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে .... টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (..)।

স্বাক্ষর   স্বাক্ষর

ম্যানেজার

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ৩৫X৪ = ১৪০/=

=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫X৮ = ২৮০/=

=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য- (বার সংখ্যা) =৩৫X১২ = ৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা : ৯৬-১০৬

কুরআনের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান-দর্শন

মেহদী গুলশানী

বিজ্ঞান বলতে আমরা জ্ঞানের সে শাখাকেই বুঝি যা জড়-বিশ্ব নিয়ে চর্চা করে। বিজ্ঞানের দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত দার্শনিক সমস্যা নিয়ে চর্চা করে। এখানে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো হচ্ছে ঃ

১. কিভাবে আমাদের জড়-বিশ্বের জ্ঞান প্রসার লাভ করে?

২. Unswelying বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূলনীতিগুলো কি?

এ দুটো সমস্যাকে আমরা কুরআনের দৃষ্টি থেকে আলোচনার ইচ্ছা করছি।

কুরআনের দৃষ্টিতে Epistemological সমস্যাসমূহ

কুরআনের দৃষ্টিতে আমাদের মনে প্রকৃত বিশ্বের একটি ধারণা আছে ঃ

'বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধবান করবে না?' (৫১ ঃ ২০-২১)

'সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব ঘটিয়েছেন।' (৬ ঃ ১)

'তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বস্তুসামগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? বস্তুত এরপর কিসের উপর ঈমান আনবে?' (৭ ঃ ১৮৫)

এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আমাদের আদেশ করা হয়েছে জড় পৃথিবী (নিদর্শন ও প্রকৃতি) সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানালোচনা করার জন্য এবং সেসব সুযোগ ব্যবহার করার জন্য যেগুলো তিনি আমাদের জন্য তৈরি করেছেন ঃ

'তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমূহ ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতি প্রদর্শনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না।' (১০ ঃ ১১)

'আল্লাহ যিনি উর্ধদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন।

REGD. NO. DA 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : April-June -2007, TK : 35